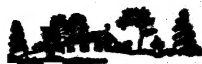


কায়কল্প

বিহ্বলভূষণ মুখোপাধ্যায়
প্রণীত

[বিহ্বলভূষণ বসু-চিত্রিত]



রক্তে ঘোষাল
৩৫ শঙ্করাপল্লী রো. কলিকাতা
১৯১১

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

অতঃ কিম্ব, কায়কল্প, চৈতালী, নীলসুন্দরী, রাবির কথামালা, রাবুর
রাবুর-দ্বিতীয়ভাগ, রাবুর তৃতীয়ভাগ, বর্ষার, কাঠে, বিদ্যেয় নীলসুন্দরী
স্বর্ণসিঁপি গরীমসী, ছৈয়বী

—কায়কল্প—

প্রথম সংস্করণ : কার্তিক/১৩৩৬

[তিন টাকা]

প্রকাশক : শ্রীযুক্ত বৈষ্ণব চৌধুরী, ১-এ, ৩৬১ হাট বাগান, কলিকাতা

মুদ্রাকর : শ্রীযুক্ত চন্দ্রবর্তী, কালিকা প্রেস লিমিটেড, ১০-এ, বাগান, কলিকাতা

ଏହିକାମି ମୁଦ୍ରାବର ଶ୍ରୀବୁଦ୍ଧ ରଞ୍ଜିତ ହାଲଦାର ମହାଶୟକେ

ମମର୍ମଣ କରା

ବ. ୧

গল্প

				পৃষ্ঠা
কায়কল্প	১
ফুটবল লীগ	১১
আঁটি	২২
সম্পদের বিপদ	৩২
বিভাষনা	৪৬
দাহুর সমতা	৫৪
আন্তিক	৬৭
কালীক গতি:	৭৫
লেখক	৮৬
ভক্ত	৯৩
কানিকা	১১১

কায়কল্যে

প্রায় সাড়ে-আটটা হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তারাপদ, সুধেন—
এরা সব উঠিতে বাইতেছিল, বৃষ্টির অস্ত্র আটকাইয়া গেল। আর এক
চোট চা আনিবার অস্ত্র ভিতরে বলিয়া দিলাম।

তাল আর জমিল না। চা শুক হইলে চায়ের পথে সাহিত্য আসিয়া
হাজির হইল, এবং তারাপদ আধুনিক সাহিত্যকে একটু ধা দিতেই
সুধেন-প্রমুখ কয়েকজন এমন তীব্র প্রতিবাদ শুরু করিয়া দিল যে, অচিরেই
ঘরের হাওয়াটা উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। শীতের সঙ্গে বৃষ্টি মিলিয়া যে দাক্ষণ
অবস্থাটা সৃষ্টি হইয়াছিল, সেটা অনেকটা কাটিয়া গেল।

তর্ক খুব জমিয়া উঠিয়াছে, যাদের কনকনানির উপর এই বৃষ্টির
রসানের কথা আমরা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি, এমন সময় বাতার দিকের
দরজাটা একটু খুলিয়া গেল, এবং এক বলক স্তম্ভিক হাওয়া এবং বৃষ্টির
ছাটের সঙ্গে হাতা মুড়িতে মুড়িতে অবিনাশ-ঠাকুরদা প্রবেশ করিলেন।
আমরা প্রায় সকলেই বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিয়া উঠিলাম, “ঠাকুরদা এ-
ছর্যোগের মধ্যে যে—এত রাত্তিরে?”

ঠাকুরদা হিহি করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আমাদের মুখের দিকে
চাহিলেন যাত্র, কোন উত্তর দিলেন না। ছয়ারটা সম্পূর্ণ খুলিয়া দিয়া
বাতাস ও বৃষ্টি জোরে প্রবেশ করিতে লাগিল, ওদিকে হাতার বলক
ঘরের যেকোন একখানি কুটির আকারে জমিয়া উঠিল। মনে হইল,
কোন কারণে ঠাকুরদা আসিয়াই যেন অপ্রতিভ হইয়া গেছেন। উঠিয়া
ছয়ারটা আবার বন্ধ করিয়া তাঁহার হাতের হাতাটা লইয়া একটু কোণে
রাখিয়া দিলাম। অবিনাশ-ঠাকুরদার একটু সন্দিগ্ধ হইল, আইতা আরুতা
করিয়া বলিলেন, “না, এখানে আসি নি,—তোবার গিয়ে, স্বপ্নের
কাছে গেছলাম। মনে করলাম, একবার দাঁড়িয়ে বাই এখানে—বৃষ্টিটা
বন্ধ হোয় পড়ছে কিনা।”

বুঝিলাম, বরূপ স্যাকরার ওখানে বাওয়ার কথাটা মিথ্যা, ঠাকুরদাকে বানাইয়া বলিতে হইয়াছে। আলনা হইতে তোয়ালে দিয়া বলিলাম, “তালোই কয়েছেন, হাত-পাগুলো একটু মুছে নিন শীগ্গির। চায়ের কথা বলে দিই ঠাকুরদা, আপনি ঐ ইজিচেয়ারে গুটিয়ে-সুটিয়ে বসুন, বৃষ্টিটা ধরুক একটু...আগে আপনাকে তামাক দিচ্।”

চাকরটাকে ডাকিয়া বলিয়া দিলাম।

আবার আধুনিক সাহিত্যের কথা তুলিবার চেষ্টা করা গেল; কিন্তু আর দে-উত্তাপ আনা গেল না। সকলেই বুঝিতেছিলাম, অবিনাশ-ঠাকুরদা এইখানেই কোন একটা কাজে আসিয়াছেন, এবং কাজটা খুব প্রয়োজনীয় ও অবিবর্ত্তর গোপনীয় বলিয়া, আসার অল্প এই সময়টি বাছিয়া লইয়াছেন। তিনি এমন একটি জমাত আড্ডা এখানে আজ মোটেই আশা করেন নাই। এমন রাত্রে বাহির হওয়ার মধ্যে যে একটা অসুস্থ কৌতুকাবহতা আছে, তাহার অল্প অপ্রতিভ হইয়া গেছেন।

চা আসিল, তামাক স্নাসিল, বৃদ্ধ কিন্তু সংকোচটা কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না যেন। আমাদের আধুনিক সাহিত্যও ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া পড়িল। একে একে সবাই উঠিয়া পড়িল।

তখন অবস্থাটা আরও অবসিকর হইয়া উঠিল। অনেক প্রশ্ন, কথচ একটিও করা বাইতেছে না। চৌকির শতরঞ্জির উপর নব্বু কিম্বা অনন্ত হিজিবিজি কাটিয়া চলিয়াছি, ওদিকে ঠাকুরদার তামাক টানা ক্রমেই অধিকতর সমন হইতেছে; বেশ বুঝা বাইতেছে, আসিবার উদ্দেশ্যটা প্রকাশ করিয়া ফেলিবার অল্প প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কোনমতেই পারিয়া উঠিতেছেন না।

সাড়ে-নয়টা বাজিল, ঘড়িই সেটা শব্দে জানাইয়া দিল। অবশেষে আবিই প্রশ্ন করিলাম, “এত রাত্তিরে বরূপের বাড়ি, ঠাকুরদা?”

অবিনাশ-ঠাকুরদা যেন একটা খেঁই পাইলেন। কয়েকবার খুব ঘন-ঘন তামাক টানিয়া বলিলেন, “আর বোলোনা পেরোর কথা ভাই, গয়নার কথা বারণ করে দিয়ে আসতে হ’ল।”

আমি বিবিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “বারণ করে? কেন?”

“বিয়ে করবে না।”

কাঁচকাঁচ

আমি অক্সিজেন বিষয়ে উঠিয়া বলিলাম, এর করিলাম, “করবে না
বিষয়ে অক্সিজেন ? কারণ ? কি বলছে সে ?”

অবিনাশ-ঠাকুরদার তামাক টানার গতি প্রায় নিশ্চয় হইয়া গেল। ভীত
কৌতুকে আমি উৎকর্ণ হইয়া তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলাম। বেশ বুঝিলাম,
যোকম কথাটি একেবারে কঠে আলিয়া পড়িয়াছে, আর বিলম্ব নাই।

ঠাকুরদা টানের ক্রান্ততার উপবোধে একটা সুদীর্ঘ সুখটান দিয়া মুখ
সুঁরাইয়া হঁকাটা রাখিতে রাখিতে বলিলেন, “কারণ আর কি ?...‘করবো
না, আমার হেঁছে’।”

এ-ভাবে উৎকর্ণ্য ঠেলিয়া রাখিবার অস্ত্র রাগও হইতেছিল, বিজ্ঞাসা
করিলাম, “তবু ?”

“...উপহার চাই—পত্নী।”—বলিয়া ঠাকুরদা আরাম-কেন্দ্রার হেলিয়া
পড়িয়া উগ্র প্রত্যাশার আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আপনা
হইতেই একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়িল।

বলিলাম, “এই কথা ? তা এর জন্তে কি বিয়ে বন্ধ হবে ? আপনি
স্নাতকরার বাড়িতে বারণ করে দিয়ে এলেন ?”

মুখের ভাবে বুঝিলাম, ঠাকুরদার মনটাও কতকটা হাত্তা হইয়াছে।

“তা হ’লে চাকরটাকে বলো, কতটো আর একবার গেছে নিয়ে
আসুক।”—বলিয়া চেয়ারটা আমার দিকে একটু টানিয়া লইলেন, তাহার
পর কণ্ঠস্বর একটু নামাইয়া বলিলেন, “গেছ পয়সার্ম করতাই তো তোমার
কাছে আগা, শৈলেনভায়া ! আজ বাদে কাল বিয়ে, সব ঠিকঠাক, শেষ
কালে কিনা তুচ্ছ উপহারের জন্তে সব ভেঙে যাবে ? কিন্তু অক্সিজেন
তো জানো ? যা ধরবে একবার, ছাড়ার কার সাধ্য ! একবার তাবলান,
নিজেই দিই একটা লিখে ; এক সময় অত ব্যক্তার পালা বেঁধে বেঁধে
বিলি করেছি, আর আজ নাতি আবদার ধরেছে—আবার তাবলান, নাঃ,
শৈলেনভায়াকেই বলি, ও আজকাল লিখে-টিকছে শুনি...”

বলিলাম, “ঠাকুরদা, আমাদের লেখা তেমনই ; তার ওপর পত্নের
কথা শুনে তো গারে অর আলো ; একবার সৌহার্দুনি করে ঢেঁটা
করেছিলাম ; মাঝপথে এসে ‘ধন’র বিল বুজতে কালখান ছুটে যায়,
অবন কপাল মুহুর্তে গিরে ‘ধন’ কথাটা মনে পড়তে সে ব্যক্তা পরিজ্ঞান
পাই ; সেই থেকে কিছু না-কি দিয়েছি, আর ও-মুখো নয়।”

ঠানদি বেচারী বকিতই হয়েছে বলতে হবে তো ? আজকাল যখন এসব হয়েছে, তখন হবে তোমার একটু বেহনৎ, তা—আর তেমন অশ্লিষে হয় নোলকটা-বলটা নাহয় বসিয়েই দিও। আর দেখ,—ইরে—আবার নাহেই দেবে, বুকে ভেঙে ?—মানে, আমি যেন পদ্যটা লিখে নাওবউকে...”

তাদের আপন বেগেই বোধ হয় ঘোরটা কাটিয়া গেল। ঠাকুরদা যেন একটু লজ্জিতভাবে হঠাৎ পাড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, “বড় রাত হয়ে গেল, তাই তো ! আচ্ছা, উঠি তাহ’লে এখন। যেমন হয় একটা লিখে দিও, নেহাৎ খালি যাবে ? তাই বলতে এসেছিলাম।”

দরজার কাছে গিয়া একটু পাড়াইলেন—একটু ইতস্ততঃ তাব ; তাহার পর ফিরিয়া আসিতে আসিতে বলিলেন, “কি দিবি পদ্যটি এখনই বললে শেলেনভায়া ! দাও তো একটা চিরকুটে লিখে। আর কিছু নয়, একটা ভালো জিনিস উঠলো তোমার মনে—ভুলে গেলেই তো গেল নষ্ট হয়ে, তার চেয়ে তাবলাম লিখে রেখেই দেওয়া যাক না কাছে।”

কবিতাটি লিখিয়া দিলাম, আরও খানিকটা শাখাপল্লবে বিস্তারিত করিয়া ; নোলক-প্রশস্তি শেষ হইলে মলেরও খানিকটা বন্দনা গাঁথিয়া দিলাম।

তাহার পরদিন সকালে ঐতি-উপহারের অল্প কাগজ-কলম লইয়া বলিলাম।

কবি নই, তার সরস্বতীর এলাকার মধ্যে ঐতি-উপহারের মতো এমন অঐতিকর কিছু নাই। নিতান্ত যদি অল্প আর তাহার নববধু লইয়াই হইত, তাহা হইলে বলিতাম না ; কিন্তু ব্যাপারটা তো ঠিক তাহাই নয়। অর্ধ-শতাব্দী পূর্বের একটি এগারো বছরের নোলক-পরা মেয়েকে ঠাকুরদা নবযুগের নববেশে নৃতন আবেষ্টনীর মধ্যে আবার নৃতন করিয়া গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন, যে-গৃহ বোধ হয় এবার শীঘ্রই একদিন ওপারের আস্থানে ছাড়িয়া বাইতে হইবে। কালকের মৈত্র কাব্য-অভিধানের গোড়ার এই কথাটাই ছিল, ঠাকুরদা না-চাহিয়াও ব্যক্ত করিয়া কেলিয়াছেন।

তাবিলাম, জীবনে অন্ততঃ একবার নাহয় কবি হওয়ার চেষ্টাই করা যাক না। এতেও যদি কবিতা না আসে তো আসিবে কিলে ?

চতুর্থ লাইনের মিল খুঁজিতেছি, এমন সময় ভিতর-বাড়িতে হঠাৎ হাসির একটা হুদুদা উঠিল। আরও অল্পাত সময় মনে ঠানদিদির গলা ! ঠানদিদি

চলেন ঢেউয়ের মতো, গতিতে থাকে হিলোল, আর উপস্থিতিতে সেই হিলোল উচ্চালে ভাঙিয়া পড়ে।

ঠানদিদি যৈখানে পৌছিযেন, সে-আয়গাটা। রসে-বিক্রপে, পানে-ভুলে-অর্দার মুহুর্তে ই আগিয়া উঠিবে—হানবিচার নাই, বয়সের বিচার নাই—একবটি বৎসরের সুদীর্ঘ জীবনে ঠানদিদি আর সবকেই বাতিল করিয়া যাত্রা একটি অবস্থাকেই বাধিয়া রাখিয়াছেন—তাহা রসোচ্ছল বৌবন। সুবিলাস, নিচে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেছে। ঠানদিদি বলিতেছেন, “না, তোরা ছাড়্, মিকিন একটু, যা করতে এসেছি আগে সেয়ে নিই সেটা...তোমার কতটি কোথায় গো? তার ঘাড়ে কাব্যা চাপিয়েছে শুনলাম! সাবধানে থাকিস্ বাছা, অমন অবরদন্ত সতীন আর নেই, তুগেছি কি না এককালে!”

গৃহীণী কিছু উত্তর দিল, কি না-দিল, বোঝা গেল না। ভয়ীর কর্তব্যর শুনিলাম, “দাদা ওপরে ঠানদি, চলো না।”

“তোরা বোস্ একটু, আমি ভূত ছাড়িয়ে আসি।...বউ, আমার কী যোগাড় করে রাখ্—পান খেঁতো করে।”

মিশ্র বিজ্ঞপ-কলরবের মধ্যে কে কি বলিল শুনিতে পাইলাম না—যাত্রা একটা প্রবলতর হাসির উচ্ছ্বাস উঠিয়া আসিল। একটু পরেই সিঁড়িতে শুনিলাম, “নাঃ, আর পারি না বাছা। বয়সের সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে আর ছাতের সিঁড়ি তাঙা কুলিয়ে ওঠে না ক্যামতার।...কোথায় গো কবি-মামুং?”

বলিলাম, “আমুন ঠানদি, কী সোভাগ্য!...কিন্তু ওকি অলুপুণে কথা! বয়সের সিঁড়ি ভেঙে আপনি তো নিচের দিকেই গেছেন—আপনার একবটিকে আমরা তো ঘোল বলেই জানি ঠানদি।”

“—না ভাই, আর চলে না।”—বলিয়া ঠানদিদি একটু ক্লান্তভাবে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর টিনের ডিবা হইতে মুখে একটু শুল আলগোছে কেলিয়া বলিলেন, “মিলে বুঝি ঘাড়ে কাব্যা চাপিয়ে গেছে কাল রাত্তিরে এসে? মুয়ে আশুন, সাতটা কাল আমার আলিয়েছে, এখন...কাল রাত্তিরে তিনে চুপসে বাড়ি গিয়ে হাজির।...‘কি গো, একি কাণ্ড!’ তা বলতে কি চায়। শেবকালে অনেক কষ্টে...কি? না, শৈলেনকে পিছু-উপহারটা নেকবার দাল-দশলা দিয়ে এলাম।’ কি আদাড়ে বোঁক হলো তো?—মুয়ে আশুন! ‘খবরদার, আর ওমুখো হবে না। শেবকালে

কিউ-বাবলে সারিপাঠিক বরক'...কিন্তু বৌক তো জানি, তাই তাবলার
একবার বেখেই আসি না হয়, বলে আসি তাহাজাডি বা হয় একটা দিক
খিকে :--তা কিছু দিকলে নাসি ? যা হয় তাহাজাডি শেরে কোর আই ।"



'...আপনার একখট্টকে আমরা ভো বোল বলেই আসি ঠানদি ।'

বলিলাম, "চোঁটা ভো করছি ঠানদি, কিন্তু হচ্ছে কই ?—এই দেখুন না ।
সেই কথাই ভো বলছিলাম ঠাকুরদাকে—বলি, ঠানবির আমলের আপনারা
বেমন এক কথাতেই কবি হয়ে উঠতে পারতেন—এ-যুগের এদের দিগে কি
আমরা পারি ভেমন ?"

ঠানবির খুঁটা ভিতর থেকে বেন একই দীর হইয়া উঠিল । গালের
পান মুখের মধ্যে নাড়াচাড়া করিতে করিতে একটা চেহারা বসিয়া পড়িল

বলিলেন, “মুখে আসুন ! কবি না হাতী !—তবে আসিয়েছে অনেক ঘরে ।
নিকছে তো নিকটেই আছে, বলে আছে তো কলম-বরে বলেই আছে, পানির
ভূঁড়িরে বার, পানির পর পানি হাত কেটে থাকে, পাড়া নিখুঁত, দেখার
আর বিরাম নেই—সোলক, খোঁপা, ছাই-কর—সে সব কি মনে আছে না ?
না, সে আজকের কথা ?...তাই বউকে বলছিলার, ‘মি, মই, মনন সতীন
যেন বরে না চোকে—মেথিল !’—ঠানদিদি বাড়টা উঠাইয়া গিয়া উঠিলেন ।

বলিলাম, “আপনার নাভবউরের সে ভর নেই ঠানদিদি ; এ যা সতীন,
এ-সতীনের টানেই আসে !”

যেন মনে হইল, ঠানদিদি মাঝে মাঝে একটু অনমনস্ক হইয়া বাইতেন ।
একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, “তা, এতই যদি উপহারের বৌক, তো
নিজেই নিকু না মিলে !”—বলিয়া অনুপস্থিত ঠাকুরদার উদ্দেশে নখের একটা
তীর ঝাঁকানি দিলেন ।

বলিলাম, “তা হ’লে তো খুবই ভালো হ’ত । বিশেষ করে তাঁর নিজের
নামে যখন লিখিতে বলেছেন ; কিন্তু কাজের ভিড়ে রয়েছেন, তার আবার
অব্যেসটাও বোধ হয় ছেড়ে গেছে...”

“—পোড়া কপাল, কাজ তো ভারি ! নাতির বিরিতে রস আরও নতুন
করে চাগিরে উঠেছে—অসৈরণ ! আর ওব্যেস ছাড়বে ? বলে, বস্তাব না
যায় ম’লে, ইন্নৎ না যায় ধুলে,—কাল আদেক রাত পয্যন্ত...”

ঠানদিদি হঠাৎ ঘামিয়া গিয়া মুখে ঝানকটা গুল ফেলিয়া দিলেন । আমি
কোন প্রশ্ন করিলাম না, মুখের দিকে চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম ।
ঠানদিদি, আমার চোখে চোখ পড়িতেই হঠাৎ যেন একটু বেশিরকম লজ্জিত
হইয়া পড়িলেন । সেটা কাটাইবার জন্যই হোক বা যে জন্যই হোক, মুখের
পান ফেলিবার অহিলার জানালার কাছে উঠিয়া গেলেন, এবং পান ফেলিতে
ফেলিতে বাহিরের দিকেই চাহিয়া বলিলেন, “আমি বলছিলাম কি শৈল,
পারিস্ তো মাথা ঘামিরে নেক, আর না-পারিস্ তো এক উপায় আছে...”

উৎসুকভাবে বলিলাম, “পারছি—যে কত সে তো দেখতেই পাচ্ছেন ।
কোন উপায় থাকে তো বলুনই না ঠানদি, রেহাই পাই ।...”

“আছে উপায় ।”—বলিয়া ঠানদিদি আসিয়া আমার চেয়ারে বসিলেন ।
বোধ হয় যেন একটু ক্লান্ত হইয়া আমার ঝানকটা গুল মুখে দিলেন, তাহার
পর ঝাঁচলের একটা পেরো গুলিতে গুলিতে বলিলেন, “আর সবই কোন্

হুলোর কবে গেছে—নাভবট এলে খুব দেখবো কি দিবে, তাই বাস্তব থেকে একটা গল্পনা বের করতে গিয়ে এই দুটো হাতে তৈরীলো। আমি কি হাই পড়লে আমি, না ভালো লাগে। হুট করে বাজাই। জা' বাহক বাধা রাখা না করে দুই গুটী দিচ্ছেই নিশ্চিৎ উপহার না কি—কান্না দিকে দি—হুট করে নামে বসেছে, গর নামেই দে—কখনো জেগে উঠেছিলো না ; কিন্তু কাজ করে গেলে তিরিয়ে দিস বাপু, আমি নিজের হাতে ছিঁড়ে ফেলবো।...এই সব কাখি হ'ত তোমাদের ঠানদিকে উপলক্ষ করে—মুয়ে আশুন, মুয়ে আশুন।—চিরকালটা এই ভাবে আলিয়েছে কম ?

ঠানদিদি আর বসিলেন না। কেমন একটা লজ্জা, গোরব আর স্নেহ সঙ্গে কতকটা অবহেলার ব্যর্থ প্রয়াসের সঙ্গে দুই টুকরা কাগজ আমার হাতে দিয়া উঠিয়া গেলেন।

কাগজ দুইটি খুলিলাম। একটির বরষ অধঃশতাব্দীর কাছাকাছি হইবে। সেকালের অল্পপ্রাসবহল একটি পদ্য—ভালো পড়া যায় না। কালি প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, তাহার উপর তাম্রাভ কাগজটি ভাঁজে ভাঁজে জীর্ণ, নিচে এক টুকরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কাগজ দিয়া ঝুৎ অংশগুলি জোড়া, তাহাও উন্টাপাণ্টা করিয়া। তবে বুঝিলাম, বাহার উদ্দেশ্যে লেখা, সে 'বাদশকলা বিধু জিনি'—কিছু একটা।

অপর টুকরাটি পড়িতে কষ্ট হইল না ; বিষয় হইল, যদিও তাহাও না-হওয়াই উচিত ছিল,—এটি কালকের আমারই লেখা নোলক-মলের স্তবগান। বুঝিলাম, ঠাকুরদাদা নিজের নামে চালাইয়া ঠানদিদিকে উপঢৌকন দিয়াছেন, ঠানদিদির নোলক-মলের বৃগ্ন অরণ করিয়া। ভালো, আমার কবিতা 'আজি হ'তে শতবর্ষ পরে' কোম তরুণীর হাতে না পৌছাক, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের একটি বাদশীর মুখিতে যে আঘাত দিয়াছে, এটাই কি কম কথা ?

'কাল আদ্যেক রাত পযন্ত'—ঠানদিদির সেই অধঃশতাব্দী অল্পবয়সের অর্ধটাও বোকা গেল।

কিন্তু সত্যই কি অল্পবয়স ? বা অল্পবয়সটা কি সত্য ? একা কি ঠাকুরদাদারই দোষ ? নাতি, বাহাকে শানাইয়ের বাশির সঙ্গে বরে আনিতেছে, তাহার মধ্য দিয়া ঠানদিদিও কি পঞ্চাশ বৎসরের আগেকার পুরাণো ঐতিহ্য পুরাণো ঐতিহ্য নতুন করিয়া আবার করিয়া লইতে চাহেন না ?

মৃত্যুবল লীল

ইতেন ব্যক্তিগত। গজা হইয়া গিয়াছে। এই একজন মানুষের মৃত্যু-কাটা প্রতিবেদন একটা খেলা তুলিল, নিজের বিচার এবং পড়িত্তি অনুযায়ী প্রশংসা বা কটুক্তি করণ করিতে করিতে মনে মনে কোক বাগানের বিশালিত পথ বাহিয়া চলিয়াছে, অভিমতের সুদর্শে এক একটা মূল আবার বেশি রকম উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে, ঠাণ্ডাইয়া পড়িয়া নিজেদের মধ্যেই বিজ্ঞপ এবং কটুক্তির আদানপ্রদান করিতেছে, হুই-একজন আমার আত্মন পবন গুটাইয়া তুলিতেছে, তাহার পর আবার সমস্ত মলটা গভব্য পথ ধরিতেছে।

গজানন জলের ধারে একটা বেঞ্চে পাশ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। এক একবার বেঞ্চার পিঠে হেলিয়া পড়িয়া নিজের ব্যাক-ব্রাশ করা চুলের খানিকটা খামচাইয়া ধরিতেছে, এক একবার আবার আধলোজা হইয়া বসিয়া স্থিরনেত্রে সাদা আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে, মাঝে মাঝে এক একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছে। পাঞ্জাবির পকেটের নিচেটা আধ হাতের উপর ছেঁড়া, ঝোলা অংশটা বাতালে ফর ফর করিতেছে।

হীক আসিয়া পাশে বসিল। তাহারও পাঞ্জাবি পিঠের কাছে প্রায় অর্ধেকটা ছেঁড়া, চুল উকখুক, দৃষ্টি উদাস। খানিকক্ষণ চুপ করিয়াই রহিল, তাহার পর আন্তে আন্তে বসিল, “বাড়ি চল, আর করবি কি?”

গজানন এলাইয়া পড়িয়াছিল, ‘উফ্’ করিয়া একটা মোটা দীর্ঘশ্বাস কেলিয়া লোজা হইয়া বসিল; বিপরীত দিকেই চাহিয়াছিল, কিরিলও না, কোন উত্তরও দিল না। একটু থামিয়া হীক আবার বসিল, “বোধ হয় বিষ্টি নামতে পারে, ভিজে যেতে হবে।”

গজানন ঘাড়টা একটু ঘুরাইয়া বসিল, “তুই এলো, আমি একটু ঘুরে আসছি। আমাদের বাড়িতে খুঁটা বাড়িয়ে একবার দিমিকে বলে বাস—খরীদটা তেমন ভালো নেই, আবার চাল কেন না নেয়।”

আবার ঘুরিয়া এলাইয়া পড়িল।

হীক না উঠিয়া চুপ করিয়া বসিয়াই রহিল। একটু পরে সাদাসার ভঙ্গিতে বসিল, “না খেয়ে কতদিন কাটাযি? সমস্ত লীগটা এখনও পড়ে রয়েছে, তারপর আই-এক-এ। একের তো হালচালই এই।”

গজানন ছুরিয়া বলিল, অবশ্যইয়ের মধ্যেও একটু রাগিয়া গান্ধী মাঝার মতো করিয়া বলিল, “ঐ বিভিন্নের খেলা ?—তুই-ই বল ? পারতো না ও আটকাতে বলটা ? বা পারে ভয় দিবে একটা হালকা আঙ্গ, তীরণর একটু ভোলা দিবে বলটা হুড়নের মাঝার ওপর দিবে উপকে দিবে একটা শট, না পারিভিল, পারনে উই! রাগিতের বয়েছে, একটু চ্যক করে দিলে আর পারের



‘...তুই-ই বল...’

ওপর গিরে পড়ে। একটা শিককে বাবিরে দিলে সেও এটুকু বুঝে দিতে পারতো, আর ও কিনা...। বেশ পারলি না পারলি মা; হাঁদা গজাননের মতো গোল-কীপারের নজর আটকে ধাড়িরে রইলি কেন ?...”

দুই চোখ হাতা হইয়া কপালের শিরা ফুলিয়া উঠিল।

হীক বলিল, “তুই তো দুটো গোল দেখেই উঠে এলি, আমার যে জোগাতি।
যে বলটা আসিলে, মনে হয় আর কিরে বাবে না। ‘আমি মনুহান, আমি
মনুহান’—তাম্র ছাড়িয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। ‘আমি’ বোঝাইবার যদি সত্য
কেউ হ’ত তো মনে বারোখানি। তুকে রীতিমত জালপিস্টলন ভরসা
হয়ে গিয়েছিল, উঠেই আসছিলাম, এমন সময় দত্ত একটা কীকা কল পেয়ে,
ভেতিন আর ল্যানবার্টকে কাটিয়ে দিলে একটা গোল শোধ দিয়ে। মনে
পেলাম, তাবলাম বুঝি হাওয়াটা কিরলো,—সার-সারের মহিমে আছে তো ?
সময় কম, আর বাকিটা যদি শোধ দিয়েও, বিতে পারে তো ...শোধ ?—পাঁচ
মিনিটের মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করে দুটো খেয়ে বললো—ফোর টু ওয়ান! মনে
মনে অপছি—মা, রেকার্ডার ঘড়ির কাঁটাটা বাড়িয়ে হইসেলটা তড়াতাড়ি
বাড়িয়ে দে একবার...”

আবার দুইজনে কিছুকণ চুপচাপ বসিয়া হুর্বাগটা লইয়া মনে মনে
তোলপাড় করিতে লাগিল।

একটু পরে হীক প্রশ্ন করিল, “তোমার সত্যিই দেবী হবে ?”

গজানন উত্তর করিল, “হবে একটু।”

“তাহ’লে উঠি। গিয়ে বোধ হয় দেখবো সে বৃড়ো দাঁত মুখ খিঁচিয়ে
টেবিল আগলে বসে আছে। বিপদ একরকম ?...এমন একটা ইয়ে হয়ে
গেল, এখন পড়ার কখনও মন বসে মাসুকের ?”

উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল, “সত্যিই তাহ’লে তোমার দিকিকে যাবো নাকি
বলে যে...”

গজানন একটু বিরক্তির সহিত বলিল, “মাথা খারাপ হয়েছে তোমার ?—
ওরা কুঁচকি-কঠাঠে গোলা থাক, তাইতেই আমার পেট ভরে
যাবে।”

হীক একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, “আমিও তো সেই কথাই বলছিলাম।
তুখু তো তাই নয়, টেঁচাতে টেঁচাতে এদিকে বেদম হয়ে গেছে লোকে।...কিন্তু
এত মাথা ব্যাথা যে বাবা ? তোরা খেলবি নি, পোল খেয়ে মরবি, আর
আমাদের পিতৃমাতৃ দার পড়ে গেছে কেন।

হীক চলিয়া গেল, গজানন আবার নিজের খুলকিটা খামচাইয়া সেইভাবে

বেকে হেলিয়া পড়িল, মনের কোতে কতকটা বেন নিজে হইতেই মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, “মা, কি করলি ? কোর টু ওয়ান !”

অনেকক্ষণ নিখুঁত হইয়া পড়িয়া রহিল। গম্ভীরা উৎসাহীরা অল্পকাল যখন বেশ গাঢ় হইয়া আসিল, ধীরে ধীরে উঠিয়া পাড়াইয়া কত দিনের উপবাসীর বস্তো শিথিলগতিতে এস্প্যান্ডেডের ট্রাম ডিপোর দিকে অগ্রসর হইল।

কালীঘাটে ট্রাম থেকে নামিয়া গজানন অনেকক্ষণ ফুটপাথের উপর চুপ করিয়া পাড়াইয়া যে দিকটা কালীমন্দির সেইদিকে চাহিয়া দাঁত দিয়া বুড়া আঙুলের নখটা খুঁড়িতে লাগিল। গজাননের বাড়িটা রাস্তার বাঁ দিকে—কয়েকটা গলি দিয়া বেশ খানিকটা বাইতে হয়। যতদিন ফুটবল চলে, ট্রাম থেকে নামিয়াই মন্দিরের দিকে চাহিয়া ভক্তিতরে একটি প্রণাম করে, তাহার পর ওই দিক দিয়াই ঘুরিয়া দেবী দর্শন করিয়া এবং মনোগত প্রার্থনাটুকু নিবেদন করিয়া বাড়ি চলিয়া যায়।

প্রার্থনা বেদিন যেমন প্রয়োজন—“মা, কাল দস্তর হাঁটুটা ঘেন একেবারে সেরে যায়, ওদিকে দু’দিন আবার রেস্ট পাবে, তখন বা মনে হয় করিস... সোমবার এসে গেল মা, ওদের ল্যাংচা গাঙুলিকে একটা দিনের জন্তে বাড়ি বুলির রেখো, যেমন করে তোমার খুশি, তবে মাথা ব্যাখার চেয়ে ভেদবমি হ’লেই পাকা হয়...আবার বাচিরে যেওয়া সে তো তোরাই হাতে—যোজই তো দেখছি কী অসীম শক্তি তোরা মা...”

কিছু কলে, কিছু বুঝা হয়—এই করিয়া কাটিয়া বাইতেছে। আজ কিন্তু চোটেটা বড় লাগিয়াছে। গাড়ি থেকে নামিয়াই মন্দির উদ্দেশ্য করিয়া যে নিয়মিত প্রণাম, সেটা এখনিও হয় নাই। বিশ্বাসের অভাব নয়, অভিমান,—আক্রোশ বলিলেও বোধ হয় বেশি ভুল হয় না, মনের মধ্যে কেবল একটা চিন্তা উল্লসিয়া উঠিতেছে—কোর টু ওয়ান।—কোর টু ওয়ান !! উক্...!

শেষ পর্বত বোধ হয় সোজা বাড়িই চলিয়া বাইত, কিন্তু একটা কথা হঠাৎ মনে পড়িয়া বাতায় গজানন বেন অতিবাহিত চকিত হইয়া উঠিল এবং মন্দিরের পানে চাহিয়া অল্প দিনের চেয়ে ভক্তিতরে একটা প্রণাম জানাইয়া দিয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল। ব্রত পছন্দে ঘেঁষিয়া মনে হয় বেন এতক্ষণ ঘুরিয়া টালমাটাল করিয়া বস্তু বড় একটা অপরাহ করিয়া কেনিয়াছে।

আরতি আরম্ভ হইয়া গেছে, ভয়ানক ভিড়, গজানন দিয়া ফুটপাথের

একটা থাম বৈসিরা দাঁড়াইল। স্থির নেত্রে বন্ধিরের পানে চাহিয়া আছে, হৃদয় ভাবাকুল—বোঝ হয় একটু বাশাকুলও। বড় তুল হইয়া গেছে, ইচ্ছা করিলেই আশ্রিতির পূর্বে আসিয়া হাজির হইতে পারিত, কেন যে এমন বতি-গতি হইল—কুলক্ষণ। যা কি মনে করিবেন? “অকস্মিক ভক্তি যে তোবার প্রতি এক ভিলও কর্ম নেই, সেটা তো বুঝতেই পারছো মা...”

আরতি শেষ হইলে শত শত কণ্ঠ-নিঃসৃত মা-মা শব্দে সমস্ত জায়গাটা গম গম করিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বাহার বা প্রার্থনা—কাহারও আর্থ লইয়া, কাহারও নিঃস্বার্থ। গজানন অল্প দিন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই মুক্তকণ্ঠে কপালে ঠেকাইয়া চলিয়া যায়, আজ শানে কপাল ঠেকাইয়া একটু পড়িয়া রহিল, উঠিবার সময় অপরাধের আয়ত্তিত্ববরণ নাকটা শানে একটু ঘষিয়া লইল, তাহার পর করজোড়ে করুণমেন্ত্রে বৃত্তির পানে চাহিয়া বলিল, “আজ যা হয়ে গেল তার আর চারা নেই মা, কাল কিন্তু মহমেদান স্পোর্টিং...”

পরদিন খেলা দেখিয়া দুইজনে কিরিতেছে, ড্র গেছে, আজ আর ইন্ডেন গার্ডেন্সে চুল খামচাইয়া পড়িয়া থাকিবার দরকার হয় নাই। খুব প্রকৃষ্টভিত্তে আলোচনা করিতে করিতে দুইজনে এসপ্যান্ডের দিকে চলিয়াছে, তাড়াতাড়ি ট্রান্স বরিয়া কালীঘাট—আজ আবার আরতিটা বেন ওরকম আধা-বৈচড়া হইয়া না যায়; গজাননের মনে যেমন একটা দুঃখুঁতুনি লাগিয়া আছে—কাল আগাগোড়া উপস্থিত থাকিলে আজ দুটা পরেই হাতে আগিত,—আজ জেতা খেলা ড্র হইয়া গেল, তাও পেনাল্টি শটে।... আজকের আগশোষ এই দিক দিয়াই, তবুও মহমেদান স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে ড্র—ওরই মধ্যে বস্তু বড় একটা গাফনা আছে, প্রার বিজয়ীর উল্লাস।

নিজেদের মধ্যেও আলোচনা হইতেছে, আবার চলিতে চলিতে পরেদের আলোচনারও বাকে বাকে যোগ দিতেছে,—“মিডিরকে যে দোষ বিচ্ছেন, মিডির যে কাল দাঁড়াতে পেরেছিল এই চের...খুব রক্তন মিড যে হে ছোকরা, মিডির কাল টানটাকে একেবারে বসিয়ে দিলে, আর...খাকুন না বশাই, একশ-তিন ডিগ্রী জলের ওপর কুড়ি গ্রেড দুইশেন ফুটে কোন্ মিডা কিড, মিডে পারে একবারে দেখবার সাধ আছে; সেহাং মিডির, তাই...”

অবশ্য মিথ্যা কথা, বাড়ির গারেই বাড়ি বালিয়া মিথ্যাটাকে আরও গুট করিয়া হুন্ হুন্ করিয়া আগাইয়া বাইতেছে। আবার অস্ত্র একদল—আজকের পেনাশি গোলটা লইয়া তীব্র আলোচনা হইতেছে, গজার্নক-হীকর গতিটা আবার একটু স্লথ হইল, আজ এদের সম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধ আলোচনাই যেন গারে বিষ ছড়াইয়া দিতেছে।



মাকটা খানে একটু থবিয়া লইল...

“বলছেন যে, আজ ওর অবস্থা জানেন? নেহাৎ ওই, তাই গোল আগলে ঠাড়াতে পেরেছিল...একশ-তিন ডিগ্রী অর গারে নিরে...”

“একশ-তিন ডিগ্রী অর।”

“কুড়ি গ্রেন্ কুইনেন টুসে কোন রকমে টলভে টলভে খেলেছে—দইলে ও পেনাল্টি তো ওর নল্য মশাই...”

“সভ্য নাকি?...তাই মাঝে মাঝে ওরকম...”

“এই হীকই তো কুইনিন এনে দিলে সেন কার্ণাসি থেকে, ওর বাড়ির পাশেই বাড়ি। বল্‌নারে হীক, কথা কইছিল না যে?”

সমস্ত রাস্তার টিমের প্রায় পাঁচ-ছয়জনের একশ-তিন ডিগ্রী জয়ের হিসাব দিয়া কালীঘাট ডিপোর ট্রাম হইতে নামিল। তাহার পর যন্মিরে প্রণামাদি সারিয়া ছইজনে গঙ্গার ঘাটের রাণায় গিয়া বসিল। হীক বলিল, “আজকে যে রকম দেখালে, মা যদি একটু দয়া করেন, লীগটা মুঠোর মধ্যে; আমার তো এইরকম মনে হয়, তুই কি বলিল গজু?”

গঙ্গানন আজ এত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে যে মাঝে মাঝে অন্তমনস্ক হইয়া পড়িতেছে। উগ্র উদ্দীপনার চোটে খেলার মাঠে মাঝার চুলগুলি বিস্রম হইয়া গিয়াছিল, এখন পর্যন্ত খেলায় করা হয় নাই; তাহারই একটা গুচ্ছ ধীরে ধীরে টানিতে টানিতে বলিল, “এখন কত বাছে? সেভেহু?”

হীক বলিল, “যাছিল সেভেহু, আজ কাস্টমস্কে টপ্‌কে আর এক প্লেস ওপরে উঠলো।”

“হু...একটা পাঠা দেখ্‌ দিকিন, আপাগোড়া কালো; তোদের বাড়ির সামনেই বস্তু রয়েছে, অনেকে পোষেটোসে।”

“মানৎ করবি?”

“বিশেষ দরকার নেই, মার নিজের টিম, একটা কি যে বলে—মারা আছেই, সেই সঙ্গে একটা গরজও; মানৎটা করে রাখলে আর একটু পাকা হয়ে থাকে। এবারে চান্সটা খুব ভালো বাছে কিনা?”

“কোন খেলাটার জন্তে করবি মানৎ—মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল, না মহম্মেডান স্পোর্টিং রিটার্ন?”

“সেটা অবহা বুকে দেখা বাবেখন, খোজ নে তো আগে।” সব কথা প্রকাশ করে বলতে নেই, ঠাকুরদেবতার ব্যাপার; তবে ওর আবার একটু ট্রিক আছে, দোব-দিছি, দোব-দিছি করে অনেকদিন টেনে নিয়ে যেতে পারা যায়। ঐ করে একই পাঠা খোটার বেঁধে রেখে মহম্মেডান, ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান সবগুলোকে টপাটপ টপ্‌কে ওপরে উঠে যেতে পারা যায়।”

হুইকনেই একটু চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর হীক বলিল, "তাতে
আবার অনেক লম্বা উল্টো কল হয়, মাঝার মকদ্দমাটা ঐ করে গেল কিনা।
যেহা মকদ্দমা; মকদ্দমার সন্ধানের দিন বলিল, দিবে যেহা কথা,
কেন্দ্রস্থিত হার দেবে। হারী মাঝারে মাঝারে মকদ্দমা দেহিবেই মাক
হাটী, হি মার আটকাতে মাক এই হুইক মিলের আত্ম-মারী পরবার
একটু দিষ্ট-কেন্দ্রন কিনা..."

গজামন বলিল, "জেনমেন জেনমেন বোঝা যায়, ঐটোকে জোড়া পাঠা করে
 দিলেই হবে। ছোটোই দেখে রাখিল, তবে মনে মনে উচ্ছৃঙ্খল করে ফেলিল নি
 যেন।...চল, ওঠ, এবার, মন্দিরের ঘাটে বসে আর এসব কথা নিয়ে বাঁচাট
 করা ঠিক নয়।"

গলির মুখে ছুইজনে ছাড়াছাড়ি হইবার পূর্বে বলিল, “আবার তরুণ তো—ইকুল থেকে সোজা তোরা ওখানে চলে যাবো, না হ’লে বড্ড দেরি হয়ে যাবে।”

এমন প্রত্যক্ষ কল দেখা যায় না, লীগ টেবিলে টীম এখন ছয়ের স্থান থেকে চারের স্থানে; চূণোপুটিদের কে পৌছে, হোমরাচোমরা টীমগুলারও আতঙ্ক ধরিয়া গেছে। চৈচাইতে চৈচাইতে গজাননের গলা ভাঙিয়া গিয়াছে, এখন চুন লাগাইয়া তাহার উপর একটি মাক্‌লার জড়াইয়া গ্যালাবি থেকে খালি হাত-পা ছোঁড়ে আর কাশে, হীকর একটা ছাতা গেছে মোড়ু খাগান যেদিন গোলটি খায়; ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের একদল ভক্তর সঙ্গে বাদামুবাদ করিতে গিয়া বা চোখের উপর একটা কালসিতে পড়িয়াছে।

কিন্তু মনের উল্লাসে আর ওসব দিকে কাহারও জ্ঞেপ নাই; তন্ত্ৰি
করিয়া যেন আশ মিটিতেছে না। খেলা থাক্ না-থাক্, সন্ধ্যার সময় আরতিটা
আগাগোড়া দেখা চাই। হিরনেত্রে করজোড়ে দাঁড়াইয়া সামনের খেলাটার
কথা যাকে মনে করাইয়া দেওয়া আর বল্লা—“যদি এই বকমটাও রেখে
বেতে পারো যা, তো আর আটকার কে ?...”

প্রার্থনার মধ্যে দিয়া কখন বা তাঁহার চোখের সঙ্গে এক হইয়া গেছেন।

কিন্তু স্বপ্নের আশ্রয় দেবিস্যাই যন উঠিতেছে না; ইচ্ছা হইতেছে
 লীগটা বন্ধন না শেষ হয় যাকের চরণ ছুটি বন্ধিয়া পড়িয়া থাকে। অনেক
 ভাবিয়া চিন্তিয়া গজানন বিদিকে স্থানিল, বিদিত, ভোর যকের বা-কালীর বন্ধ

কুটিল লীগ

পটখানা আবার স্বাধার নিয়মে দিন কতক টাঙ্গিরে রাখবে? সাননে হাক-ইয়ারলি একমাবিনটা আসবে, আর এবিকে কল-ভাড়াটায় বে কল যাকবে না কলবে পরবহি না—”

মিদি বলিলেন, “তা রাহ, প্রোত কল দেবে দেবতার দায়িত্ব নাহিন—না হর একটি বকুল গঠি ফিরেই আসে না।”

“তুই অনেক দিন থেকে বিহুর-ভিহুর হোয়াছিল, কলজন দিইছিল, একটু জাওত, তাই বলহিলাম।”

ভালো কথাই,—ওই বলোবতাই হইল। সন্ডে হইয়াই হোক বা উঠিতে বলিতে নিরন্তর প্রার্থনার তাগিদে জালাতন হইয়াই হোক, বা আর একটু অল্পগ্রহ করিলেন,—চারের স্থান থেকে চীষটা তিনের স্থানে উঠিয়া আসিল। মাঠ থেকে ফিরিয়া গজানন কালীর পটখানা নামাইয়া একটা ছোট জলচৌকির উপর স্থাপন করিল এবং পরদিন হইতে মালা, ফুল এবং চন্দন দিয়া রীতিমত পূজা আরম্ভ করিয়া দিল,—ভাঙা গলাটা দেখাইয়া দিগিকে বলিল, “এটা যে যেতে চাচ্ছে না, তাই নাবিরে কেলৈ এই ব্যবস্থা করলাম।”

মাঠ থেকে মোহনবাগান-কাস্টম্‌স্‌এর খেলা দেখিয়া কিরিতে কিরিতে হীককে বলিল, “পাঁঠা ছুটো ঠিক আছে রে?”

“আছে, তবে বুড়ী তাগাদা দিচ্ছিল।”

গজানন ঠোঁটের কোণে অল্প একটু হাসিয়া আড়ে চাহিয়া বলিল, “আর কটা দিন টেনে নিয়ে চল না, যা বলেছিলাম মিথ্যে কি?—দেখতেই তো পাচ্ছিস।”

তাহার পর গজীরভাবেই বলিল, “তা ভিন্ন দাবটা এখনও জমেনি; আমি অল্পখে পড়লেই দিদি কিছু কিছু করে মানৎ করে সিঁহর চূপড়িতে ফুলে রাখে।...কত চাইছে মাগী? পাঁচ টাকা না?”

“ওদিকে তাই ঠিক হয়েছিল, কাল আবার বলছে হ’ টাকা চাই,—একটার; বলে, আমি ছ-ছুটা খন্দের কিরিরে দিরেছি, আট টাকা পর্যন্ত দিতে চাইছিল, স্বেহাৎ মানন্তের পাঁঠা বলে...”

গজানন চিন্তিতভাবে দাঁতে নখ খুঁটিতেছিল, বলিল, “কাল দেখলাম চারটে টাকা জমেছে। দরকা পেট ব্যথার নাহ করে একটা দিন পাড়ে থাকতে পারলে ওটা পুরো হয়ে যায়। তারপরে দিগিকে বললেই হবে, বঙ্গ দেখলাম—না বললেন, অল্প পূজো না দিরে একটা পাঁঠাই দিল। দিদি ভরে

জুই বাকে, রাখি হয়ে বাবে। এই মতনব এটে য়েখছি, কিন্তু একটু বিছানি মোর তার কুরসংই হচ্ছে না যে...”

হীক বলিল, “জোড়া পাঠার কথা বলেছিলি না ?”

গজানন একটু চোখ টিপিয়া বলিল, “লীগটা তো এইতে আদুক,—
এর পর আই-এক-এ নেই ?—ডরল হোক, তবে তো ডবল পাঠা...তুই
হতভাগা পেটের কথা সব বের করিয়ে দিস বড্ড ..”

নাগাড়ে জলে-ভেজা, চীৎকার, তাহার উপর মাঝে মাঝে হুঁবোহুঁবি—
হীক বেচারি অস্থখে পড়িয়া গেছে। বিছানার পড়িয়া উৎসুকভাবে প্রতীক্ষা
করিতেছিল, গজানন আসিয়া বালিশে একটা চড় মারিয়া বলিল, “টু-টু নিলু !
ব্র্যাকেটে সেকেন্ড ! পুগে আজ একখানা খেললে বটে ; ঠ্যাংটা কেটে
স্পিরিটে ডুবিয়ে রাখতে ইচ্ছে করে ! রানাস-আপটা তো বাধা। কাল
রেজাসকে হাফ-এ ডজন দেবেই, তারপর বাকি থাকে মাত্র দুটো খেলা—ও
তুই দেখে নিল, কাউকে আর দাঁড়াতে হচ্ছে না।”

হীক বলিল, “ইস্টবেঙ্গলটা রয়েছে...”

“আমায় আর মেলা বকাস্ না হীরে, একে গলাটা কোন মতেই সারিয়ে
উঠতে পারছি না।...ইস্টবেঙ্গল ! ফুঁরে উড়িয়ে দেবে ! লিখে রাখ, না
মেলে তখন বলিস। সব গোলকাণার দল, মিড্‌ফিল্ডে কেরামতি গজাও
দেখাতে পারে, ড্যালহাউসির দিন কি কেলেঙ্কারিটা করলে বল্লে, শুকে খেলা
বলে ? ওরকম প্যাটান্ বোনা সে তো মহাকালী পাঠশালার মেয়েরাও পারে।
...আমাদের হারিরে লীগ নেবে ! বলে বলে লাভানে হাত ধুক গিয়ে !”

গলা ধরিয়া খানিকটা কাশিয়া বলিল, “আর এ রবার-টারার গলা নিয়ে
পেরে উঠি না ; তুই আছিল কি রকম ?”

হীক বলিল, “আর থাকা ! এমন খেলাগুলো চোখের সামনে দিয়ে চলে
যাচ্ছে।...হ্যা, ঠিক কথা, আজ বুড়ী এলেছিল—বলে, পাঠাটার জন্তে আমার
নষ্টাকা দিতে চাইছে, তোমরা যদি সাত টাকা পর্যন্ত দিতে পারো তো ধরে
রাখি, নয়তো ছেড়ে দিই।”

গজানন চোখ তুলিয়া কি ভাবিল, তারপর প্রশ্ন করিল, “কি বলিল ?”

হীক বলিল, “রাখি হ’তে হ’ল, মানৎ-করা হাসল।”

গজানন বলিল, “বেশ করেছিল ; আবি একটা কথা ভাবছিলাম—খন

পাঁচ টাকা আর ছাপাটা পাঁচ টাকার কিনে দিছি, তখন লীগের উপর ভরসা
অল্পখের ব্যাপারটাও চাপিরে দোখো না কেন ? তাহলে তাড়াতাড়ি কোর
উঠিসু আর কি, আমি তো এতে কোনও ঘোব দেখছি না।”

অল্পখের কথা, তাহার নিজের প্রশ্ন লইয়া ব্যাপারটার মধ্যে একদম
তক্কতা, হীকর বেন কেমন-কেমন ঘোব হইল ; একই বৃহৎ পোছের আপত্তি
জানাইল, “বেলা চানলে শেব কালে বেন আবার না হিঁড়ে যায়।”

গজানন বলিল, “তুই ধরতে পারছিল না, লীগ নিয়ে মানব করেছি, তবু
জিতলেই হবে না তো, আমাদের হুঁজনের দেখাও চাই—হিসেব মতো এক
পাঁঠার মধ্যে এসে যাচ্ছে নু ?”

* * * *

চারদিন পরের কথা। হীক সারিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এক পাঁঠার হুই
কাজ হাঁসিল হইল না, রেজার্স কাকতালে একটা গোল চাপাইয়া দিয়া
এগারো জনেই রক্ষণ বিভাগে থাকিয়া সময়টা কাটাইয়া দিল ; গোলটা আর
শোধ দেওয়া গেল না।

গজানন নিজের ঘরে চৌকির উপর পাশ কিরিয়া শুইয়া আছে, হীক
তাহার পিঠের কাছে পা খুলাইয়া বসিয়া আছে। সামনেই জলচৌকির
উপর কালীর পট, অল্প দিন এই সময় সামনে কিছু টাটকা ফুল থাকে, ধূপদানি
থেকে ধূঁয়ার কুণ্ডলীও আবর্তিত হইয়া ওঠে, আশে সব কিছু নাই।

হুঁজনের মধ্যে কাহারও মুখে কথা নাই, অল্পদিন হীক মাঝে মাঝে এক
আধটা সাঙ্ঘনা দেয়, আজ আঘাতটা এতই অপ্রত্যাশিত আর গভীর যে,
তাহার মুখেও কিছু জোগাইতেছে না।...একবার এ-বুকের, একবার ও-বুকের
পাঁজরা খসাইয়া এক একটী দীর্ঘশ্বাস উঠিতেছে। অনেকখানি রাত্রি
হইয়া গেছে।

গজাননের বৃদ্ধা দিদি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। বার পাঁচ কিরিয়া
গেছেন, আবার আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কাতরভাবে বলিলেন, “ওরে গল্প,
ওঠ দাদা ! খাবিনে, একি গেরো বল্দিবিন্ !...রাবার রাাত্রা চলে যাচ্ছে,
আবদ্বি বুক বাঁধছে, আর সামান্য এক খেলা নিয়ে...অ হীক, তুই বল্দি দাদা,
তোর কথাটা শোনে...”

হীক স্থির দৃষ্টিতে কালীর পটখানার পানে চাহিয়া ছিল, কক্ষপভাবে দুখ

ফিরাইয়া বলিল, “আজ যে আর বলবার মুখ নেই দিদি, রাজ্য খেলে রাজ্য কিরেও আসতে পারে, কিন্তু লীগ একবার হাতছাড়া হ’লে...উক্ রেজাস!”

আরও বস্তুখানেক পরের কথা। বৃদ্ধা ক্লান্ত এবং নিরাশার অবসর হইয়া গাফা খাবার সামনে করিয়া একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, যদি বাজার গন্ধে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন, গজাননের ঘরের দিকে বলিতে বলিতে চলিলেন, “ওরে অ গজু, ওঠ লক্ষ্মী আমার, দাদা আমার...এবার জিতবি, আমিই ভালো করে মার পুজো দিয়ে আসবো, বুড়ো মানুষকে আর কত...”

ঘরে কিন্তু না গজানন, না হীরা,—পট-বসানো জলচৌকিটাও শূন্য!

গজানন তখন গল্পার ঘাটে। হাঁটু পর্বন্ত জলে নামিয়া কালীর পট-খানার নিচের অর্ধেকটা পর্বন্ত জলে ডুবাইয়া ধরিয়াছে। মজ্জমান ছবির মুখের পানে স্থিরনেত্রে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া গভীর ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, “শেষকালে মা রেজাসের কাছে! মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান গেল—শেষকালে রেজাস!...লীগ-টেবিলে তার পোজিশানটা কি একবার চোখ মেলে দেখেছিল? নিজের টার নিয়ে কিনা রেজাসের কাছে!...তবে আর কিসের পুজো, কিসের পাঠা?—কিসের গুমোর আর কিসেরই বা বেঁচে থাকা?”

পটটা মাঝ দরিয়ার দিকে ঠেলিয়া দিয়া ধীরে ধীরে গৃহান্তিমুখী হইল।

[আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয়া সংখ্যা, ১০০০]

আট

আজ আর মনের সে সজীবতা নাই। পৃথিবীর ভালো-বন্দ, সুখ-দুঃখ কিছুই মনে আর ভেবন লাড়া আগার না। কেমন যেন আত্মকেন্দ্রিক হইয়া পড়িতেছি। নিজের কতকগুলি প্রয়োজন আছে; সেইগুলি সিদ্ধ হইলেই জীবন,—বাক্য, দিনটা কাটিল একরকম। আমার জীবনের বাহিরে আমারই বড়ো অসুভূতি লইয়া এই যে জগৎ, তাহার প্রয়োজন কতটা বিচিহ্নিত হই না-বিচিহ্নিত হই তাহাতে আর আমার দার আসেন না। ভালোই আছি এক দিক দিয়া—তবে বাবে মাঝে এক একবার কেমন একটা ভয় হয়,—একি আমার আত্মার মন্বয় বৃত্তা?...পীড়ার কথা ভুলিবার সময় নাই,—আনি,

আজ্ঞা মরে না। কিন্তু আমি গীতা-কল্পিত কৃত্যের কথা বলিতেছিলাম। আমি অল্পতব করিতেছি আমার চারিদিকে একটা অল্পতব দেয়াল উঠিতেছে; আমি আছি, কিন্তু তুমি থাকাই কি বাঁচিয়া থাক। আমার অল্পতবিত্তে যদি জগৎ না বাঁচে, তাহার লুপ্ত-হুঃখের চেউ যদি আমার মনে দোলা না দেয়, তো সেটা কি বাঁচা? আমি অল্পতব করিতেছি, এত লুপ্ত-অল্পতবে এত বিচিত্র এই জগৎ-সংসারের স্পন্দন আমার চারিদিকের সেই অল্পতব দেয়ালে লাগিয়া নিম্পন্দ হইয়া যাইতেছে।...এখন তবুও অল্পতব করি, হুদিন পরে এ অল্পতবিত্তকুণ্ড থাকিবে না। দেয়াল হইয়া উঠিবে আরও উর্ধ্ব, আরও ঘাতসহ, আমি হইয়া পড়িব আরও বিচ্ছিন্ন। হয়তো নিজে-কে-ঘেরা সেই আরও নিশ্চিত জীবনে থাকিব ভালোই। কিন্তু মরিব।

কি কারণ এর?—ক্রমবর্ধমান বল। অনেক দেখা, অনেক করার ফল? বুড়ো চাকরটা মাঝে মাঝে বলে, “অনেক দেখলাম বাবু, অনেক করলাম, মনে এখন ঘাটা পড়ে গেছে।”

যেটাকে দেয়াল বলিয়া মনে করিতেছি, সেটা কি মনের চারিদিকে এই ঘাটা? কেন হয় এমনটি?

কেন জানি না, আজ অলস সন্ধ্যার বলিয়া বলিয়া বহু পূর্বের একটা দিনের কথা মনে পড়িয়া যাইতেছে—যখন ঠিক এমনটি ছিলো না। সেদিনের কথা মনে করিয়া আজকের এই-আমাকে কি কমা করিতে পারিব আমি? আপনারাও বিচার করিয়া দেখুন না।

নূতন চাকরি লইয়া বিশেষে আসিয়াছি। আমার চরিত্রে একটা নূতন বাহুল্যের দিক ছিল,—মহাজনদের জীবনী পড়ার একটা অত্যধিক কৌতুক। যতই পড়িতাম, মনে হইত জীবনটাকে যথেষ্ট বড় করিয়া তুলিতে পারিতেছি না, ততই অশান্তি লাগিয়া থাকিত, ততই পড়িতাম। এই করিয়া দিন কাটিত।

সেদিন কাহার জীবনী পড়িতেছিলাম ঠিক মনে পড়িতেছে না। তবে পড়িতেছিলাম। বহুদিন পূর্বের কথা হইলেও চিত্রটি আমার চোখের সামনে এখনও স্পষ্ট। সকালবেলা, বোধ হয় রবিবার বা শুক্র কোন্‌ ছুটির দিন—মনে চিত্তাটিকে অবলম্বন করে—সেটিকে বহিয়া থাকিতে বেশ একটু নিশ্চিত অবসর পায়। বর্ষাকাল, ফুল হইতেছিল, লকেশ্বর একই বহিয়াছে,

আকাশে এবং পৃথিবীতে একটি করুণ ভূপ্ত ভাব। একখানি ডেক-চেয়ারে ঠেস দিয়া বারান্দার কাঠের থামে পা দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছি। বৃক্সের উপর একখানি ভাঁজ করা বই, এক জারগার আমার দক্ষিণ হস্তের চারিটি আঙুল প্রবেশ করানো। মহাপুরুষের জীবনী,—কী একটা সৰু করুণ মহেশ্বরের কথা পড়িয়াছি, সেই দিনটির সঙ্গে স্মৃতি স্মৃতি মিলিয়া গিয়াছে—মনটাকে উদাস করিয়া দিয়াছে, দেখিতেছি, মহাকাশের আত্মদান,— নীরব সমারোহে নিজেকে বিলাইয়া দেওয়া।

আমার বারান্দার নিচেই গলি, বর্ষায়, পানিবিরল। একটি শীর্ণ গোছের মানুষ তালি-দেওয়া একটা ছাতা মাথা দিয়া আমার সামনে দিয়া চলিয়া গেল, একটু গিয়া দাঁড়াইল, মাথা নিচু করিয়া কি যেন একটু চিন্তা করিল, তাহার পর একবার আমার দিকে চাহিয়া লইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া বারান্দার ধারটিতে দাঁড়াইল।

সত্য কথা বলিতে কি মনটা যদিও খুব করুণ স্মৃতি বাঁধা ছিল, তথাপি বেশ সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। ঐটুকুই মনে আছে, কেন যে পারিলাম না এখন স্পষ্ট মনে নাই। একটা কথা বোঝ হয় সত্য—মন যখন খুব বড় একটা চিন্তা লইয়া থাকে, তখন চিন্তা লইয়া থাকিতেই ভালোবাসে, বড় কাঁজ আসিয়া পড়িলে তাহার ব্যাঘাত হয়। মনে হইল লোকটা কিছু চায়। দানের যোগ্যই মনের অবস্থা ছিল, কিন্তু দানের পাত্রকে একে-বারে এত হাতের কাছে পাইয়া বেশ প্রীত হইলাম না। যে উপায় চিন্তা আকাশ ব্যাপিয়া ডানা মেলিয়া ছিল, সেটা যেন একটা গভীর মধ্যে আসিয়া আটকাইয়া গেল। তাহা ভিন্ন আর একটা কথা ছিল,—লোকটার চেহারার মধ্যে একটা রক্ততা ছিল বাহা অন্ততঃ প্রথম দর্শনেই বেশ একটি করুণার ভাব জাগায় না। করুণা একটা রস, তাহার প্রকাশ আঁটের মধ্য দিয়া, স্তম্ভরূপে একথা স্বীকার করিতেই হইবে নিছক দারিদ্র্যই করুণা উদ্ভেদ করিতে পারে না, তাহার মধ্যে আঁটের কিছু থাকা চাই। লোকটার মধ্যে তাহা কিছু ছিল না; তাহার রক্তাক্ত কোটরগত চক্রে, অবিভক্ত কেশে এবং সন্তুষ্ট পতিবিরির মধ্যে একটা লম্বীছাড়া ভাব ছিল নিশ্চয়, কিন্তু সে আত্মর ভাবটি যেন ছিল না, বা সন্বেদনাকে আত্মদান করে। বোধ হয় সবই আমার ঐ মনের কুল—, চিন্তার ব্যাঘাতজনিত বিরক্তির বোধ হয় আসল কারণ; কিন্তু মোট কথা আমি প্রীত হইলাম না।

আকাশের পানে চাহিয়া থাকায় বাবা পাইয়া বইটা খুলিলাম, পড়ার জন্য নয়, বিরক্তিতে প্রকাশ করিবার একটা উপায় হিসাবে। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসে ফিরিয়া দেখিতে হইল। লোকটা বুকের দিকেই চাহিয়াছিল, শ্রান্ত এবং কতকটা লজ্জিত কণ্ঠে বলিল, “না বাবু, উঠি, আপনাকে বিরক্ত করলাম।”

সঙ্গে সঙ্গে আরও যেন কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, “ইচ্ছে করেই কি করি বাবু? ...আচ্ছা বাই, কিছু মনে করবেন না।”

বুট্টাটা শুঁড়ি শুঁড়ি আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল, সে উঠিতেই হঠাৎ বেশ জোরে নামিল। তাহা সত্ত্বেও নামিয়া বাইতেছে দেখিয়া বলিতে হইল, “একটু থলে যাও না হয়।”

সিঁড়িতে এক পা নামাইয়া দিয়া লোকটা ঘুরিয়া একটু দূর হাঁসি হাঁসিয়া বলিল, “আমার আবার বুট্টা বাবু। একটা মাহুদ বাড়িতে গলেমিরে হয়ে পড়ে রয়েছে, মাথার ওপর চালে খড় নেই, একটু আগুন করবে তার উপায় নেই, পেটে অন্তের কথা ছেড়েই দিলাম...”

হঠাৎ রক্তাক্ত চক্ষু দুইটি দুই বিন্দু জলে ঝাপসা হইয়া উঠিল, লোকটা যেন কথাটা ঘুরাইয়া লইবার জন্যই প্রশ্ন করিল, “ঐ সারনের বাড়িতে কিরা এসেছেন বাবু?”

আমার অন্তর যে আর্টকে খুঁজিতেছিল, ওর আশাহত দৃষ্টিতে ফিরিয়া পাড়াইবার ভজিতে, হঠাৎ উল্লসিত চোখের জলে, সবার উপর ওর কথা ঘুরাইয়া লইবার কুণ্ঠিত প্রশ্নে কি সেই আর্টের সন্ধান পাইল? বলিতে পারি না, তবে আমার মনটা যেন মোচড় দিয়া উঠিল, বলিলাম, “উঠে এসো, ব্যাপারটা কি?”

লোকটা উঠিয়া আসিয়া আবার পূর্ববৎ দ্রুত বন্ধা করিয়া বারান্দার ধারটিতে বসিতে বাইতেছিল, বলিলাম, “ভেতর দিকে এসে বোসো, কুটির ছাট আসবে।”

নত কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে লোকটা সরিয়া আসিয়া দেয়াল বেগিয়া বসিল, বলিল, “ব্যাপার এক কথার বলবার নয়, বলে আপনার মন ধারাপ করতেও চাই না বাবু। এক সময় ভালো দিন দেখেছি, আজ ঘরে সন্ধান আসছে, প্রথম সন্ধান, হাত পাঁততে বেরিয়েছি। যদি ঝালি হাতে কিয়তে হয় তাকে জেঁ হারাবোই, তার মাকেও বোধ হয় ঘরে রাখতে পারবো না। আবার না এই শক্ততাই কবে গেছেন বাবু...”

বুড়ি আরও জোর হইরাছে। অসুস্থ করিতেছি, কাক্‌শ্যের রসে মনটি ক্রবীকৃত হইরা আসিতেছে। কোতুহলী হইরা প্রশ্ন করিলাম, “কি রকম? মায়ে কি শক্ততা করলে?”

“করলে বই কি। সন্তান হয় নি, হয় নি; কি কন্তি হজিল!—তীর্থ করিয়ে, কত হাদ্য করয়ে, সাধু-সন্ন্যাসীকে দিয়ে কত যন্ত্রস্ত করিয়ে—কত ধরচপত্র করে তার মনকাঁমনা পূর্ণ হ’তে চললো—এখন কোথার সে? এসে দেখুক, বংশের চুলালের অস্ত্রে দুর্বোঁগ মাথায় করে...”

হেঁড়া কামিষের নিচেটা ধরিয়া চক্ষে দিল। বলিলাম, “থাক,—কষ্ট হয়, তুলে কাজ নেই” সে সব কথা। সংসারের নিয়মই এই, একদিনের যা সাধ, অন্তদিনে তা বোকা হয়ে দাঁড়ায়।...বাড়িতে তোমার আছেন কে?”

“কষ্টের কথা কাউকে বলি না বাবু, শোনবার লোক পৃথিবীতে খুব কম, বোকাবার লোক আরও কম। ‘আহা’ বলে, তাও ঠাট্টা করে, লজ্জাই সার হয়ে বাবু। আজ ঠিক পাঁচ মাস থেকে আমার এই রকম দশা। মা সহ্য করতে পারলেন না, ঠিক যে দুঃখের জীবন ছিল তাঁর এমন নয়, তবে এতটা সহ্য করা করা অস্বাভাবিক ছিল না। আজ ঠিক তিন মাস হ’ল তাঁকে হারিয়েছি...তাবল্যাম—থাক, দুঃখের সংসার বসত হালকা হয়ে ততই ভালো, যে যার সেই বাঁচে। সামান্য একটা কুজি ছিল, এক জায়গার খাতা লিখে দশটা টাকা আসছিল, দুটো পেট কোন রকমে চলে যাচ্ছিল, মাস দুয়েক হ’ল সেটি গেলো। শাওড়ী কান্নিতে ছিল, তার ওপর টান পড়লো; দ’য়ের টান বাবু, যে যেখানে আছে সবাইকে টেনে ডেনাটবে কিনা। মেয়ের ঐ অবস্থা, শাওড়ী থাকতে পারলে না। এসে কল এই হ’ল যে, হাতে বুড়ো বয়সের সখল যে ক’টি টাকা ছিল সব শেষ হ’ল। আজ চার দিন থেকে...”

যর রক্ত হইরা আসার খামিয়া গেল।

বুড়ি আরও জোরে দাবিল।

কতকটা বেন শক্তি হৃদিতে মেয়ের পানে চাহিয়া লোকটি বলিল, “আর কী বর্ধাই পড়েছে বাবু এই চার দিন থেকে! আজ দু’দিন হ’ল শাওড়ীর হাতেই শেষ টাকা দুটি ডাক্তারের পকেটে গেল। আমি বারণ করেছিলাম, বললাম—‘হুড়ে বাও, বার বারের সে বাক্ এই দুঃখের সংসার থেকে।’ কিন্তু যারের প্রশ্ন তো? শেষ দু’টি টাকা বের করে দিলে। ডাক্তারকে ইচ্ছে

হ'ল একবার কাকূতি-মিনতি করে বলি—বললে বোধ হয় নিতো না ডিকিটো, অন্ততঃ আদেকটা বোধ হয় রেয়ারেং করতো—কিন্তু অবস্থা দেখে বার নিজের দয়া হ'ল না, তাকে প্রার্থণা করে বলতে পারলাম না, কেমন জিতে বেবে গেল বাবু। কল এই হ'ল, ডাক্তার দেখানো হ'ল, কিন্তু তার ওষু আর কেমনার উপায় রইল না।...হালি পায় না বাবু।

“কিন্তু বার কপালে চুখ ভোগ আছে তাকে আটকার কে বাবু? ওষু না খেয়েও তো মরণ-যন্ত্রণা নিয়ে বেঁচে আছে এখনও। কিন্তু বাঁচবে না, আমার এই পথে বের করবার জন্মে যতটুকু বেঁচে থাকে তাদের। ওষু দরকার, খোরাক দরকার, একটু শুকনো জায়গা দরকার, সব চেয়ে আগে পণ্ডতির ঘরে একটু আগুন দরকার। শেষ পর্যায়ে পর্বত খুঁজে বুড়ী পাগলের মতো হয়ে গেছে বাবু, গিয়ে দেখবো বোধ হয় সব শেষ...”

যেন অসহ্য যন্ত্রণার নিজের মাথার কক কেশের খানিকটা ধামচাইয়া বরিয়ানতদৃষ্টি হইয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল। আমার মনটা বেহমলার টনটন করিয়া উঠিল। বুঝিলাম এত কথা বলাইয়া লোকটার প্রতি অবিচার করিয়াছি, তাহার চুখের স্মৃতি মমিত করিয়া তুলিয়াছি মাত্র। যা দিবার ক্রমতা সেটুকু দিয়া বিদায় করিয়া দেওয়াই উচিত ছিল আমার। বাহ্যকে মধ্যবিত্ত বলি তাহার সবচেয়ে নিম্ন যে স্তর, মনে হইল লোকটি সেই স্তরের। নিরশ্রুণীয় হীন দারিদ্র্যের সঙ্গে মধ্যবিত্তের সম্বন্ধজ্ঞান বিশিষ্ট একটা অভ্যস্ত করুণ দৃষ্টের সৃষ্টি করে। পারে জুতা দিতে, পারে আনা পরিতে হয়, কিন্তু সেগুলো নগ্নতাকে যতটা ঢাকে সেলাইয়ে, তালিতে সেটাকে তার চেয়ে ঢের বেশি বীভৎস করিয়া ফেলে। এদের তত্ত্ব অধ্যয়নের আলোচনা করিয়া অনাহারের লজ্জাকে চাপা দিতে হয়। মান রক্ষার জন্য রূপে-ভিকার প্রতি-নিয়তই মানকে জলাঞ্জলি দিতে হয়। সবচেয়ে বনটি থাকে গৃহবীর উপর বিরস হইয়া, অথচ হালিস অভিনয়ে সে অস্বাভাবিক বিরস স্তম্ভকে গোপন করিতে হয়।...এখানে অভূক্ত সম্মান কাঁদিলে দারেরা সম্পন্ন গৃহস্থের কথা বার করিয়া বলে—আবদার ধরিয়াছে। জানে আবদারটা হয় শব্দের জিনিসের জন্য, তবু ঐ বলিয়া মান বাঁচার, বরং যাতে প্রতিবেশীর কানে গুঞ্জে কথাটা সেই উদ্দেশ্যে একটু জোরেই বলে।

একটা নির্দোষ প্রবন্ধনার বর্ষ-স্মৃতি করিয়া এরা কোন রকমে বাঁচিয়া থাকে, অন্ততঃ জানে বাঁচিয়া আছি। সেও একটা প্রবন্ধনা,—আমি-প্রবন্ধনা, কেন না

উন্নত দৃষ্টি আমি জন্মে দেখি নাই। আমি একটা কুশল প্রশ্ন যুখে করিয়া
নামিতেছিলাম, সব ভুলিয়া অতি বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম।

দৃষ্টি উল্লীংগেটা দোলাইয়া প্রশ্ন করিল, “আপনি বাড়ির কত?”

কেমন একটা অহেতুক ভয়ে বুকেটা কাঁপিয়া উঠিল। কত’মিটা অত



‘পাড়ার সবাই শুক ভয়ানোকেয়া!...’

কাহারও ঘাড়ে চাপাইতাম, কিন্তু বাড়িতে আমি একলা। একটু অলিত কণ্ঠে
বলিলাম, “হ্যাঁ।”

আবার শরীরের উল্লীংগেটা দোলার সঙ্গে একটা টানা শব্দ হইল, “হঁ...”

কিন্তু উল্লীংগেটা পরশরের সুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। তাহার পরেই
বোঝা গেল।—

‘কত!—কতলোক! ট্যাকার পরবাই হয়েছে! ট্যাকার পরবাই হয়েছে’

তো নিজেরা উজ্জ্বল থাক না—হাজারটা রাস্তা তো খোলা রয়েছে, শেষের বাড়ির লোকদের ডেকে, উৎসাহ করে নেশার টাকা জুগিয়ে শেষের বাড়ি পাঠাবে কেন? আজ পাঁচটা দিন যে-মাত্র বাড়ির চৌকাঠ বাড়ায় নি, অ-স্থানে কু-স্থানে ঘুরে নেশা-ভাং করে বেড়িয়েছে—তন্দ্রলোক কোথায় তাকে একটু ভালো সলা দেবে, না ট্যাকা দিয়ে আরও আত্মারা দেওয়া! একটা নয়, দুটো নয়—একেবারে দশ-দশটা ট্যাকা!—খসু করে বেরিয়ে গেল তন্দ্রলোকের পাকেট থেকে!—কী খাজাখা নবাব রে!”

প্রথমটা একেবারে অভিজ্ঞত হইয়া গিয়াছিল—এমন জীলোক দেখি নাই, এমন কঠও শুনি নাই, এমন ভাবারও কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। বাড়ির সামনে এ একটা বিসদৃশ দৃষ্ট, নিজেকে খুব সংবত করিয়া লইয়া বলিলাম, “বাহা, একটু ঠাণ্ডা হও, তোমার জামাই আমার বললে, বাড়িতে তার জীর প্রসব হবে, হাতে একটি পরলা নেই...”

আগুনে যেন দ্ব্যতাহতি পড়িল। টপ করিয়া ঘুরিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া সমস্ত পাড়াটা সাক্ষী রাখার ভঙ্গিতে হাত তুলিয়া সে যে চীৎকার আরম্ভ করিল, এখন পর্যন্ত আমার কানে থন্ থন্ করিয়া বাজিতেছে :—

“পাড়ার সবাই শুদ্ধক তন্দ্রলোকেরা!—আমার পুরুষকে আমার জামাই বলে গালমন্দ কছে, ট্যাকা দেখিয়ে তাকে উজ্জ্বল দিছে, আবার বলে মাথা ঠাণ্ডা করে...তন্দ্রলোক!—ও, দেখেছি কি এখন মাথা পরবেন—আমি জী-হত্যে, আগু-হত্যে হবো।...আমার ট্যাকা কে ধার তার ঠিক নেই—সে হারামজাদা মিন্‌সেকে সারেজা করে আনি, আর পাড়ার তন্দ্রলোকেরা বাস সাধে...আমি খুন হবো, আগু-হত্যে হবো! হাতে হাতকড়ি পড়াবো এমন সব তন্দ্রলোকদের, তবে আমার নাম রাবী পরলানী!”

শেষের কথাগুলো বহুদূর থেকে শুনি, তাহার পর একটা গলির দিক ঘুরিয়া একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনি কিছু শুনিতে পাই নাই। ওর পিছন কিরিমার জুতোপে, চাকরকে বাড়ির চার্জে রাখিয়া আমি নিঃশব্দে থিকথিক মিলিা ব্যহির হইয়া আসি।

ভাবিতেছি—মনের চারিদিকে যে দেয়াল উঠিতেছে, রাবী পরলানীই কি তাহার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল? না, তাহার সেই আটক, ‘পুরুষ’? না, উভয়েই?

সম্মদের বিপদ

বিকাশ ঐক্যভাবে বাড়িতে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কাকা কোথায় গেল গা ? বড় দরকার, এদিকে আর একটুও সময় নেই, অথচ...”

পশ্চিমের ঘর হইতে লাড়া আসিল, “কেনরে বিক ? আমরা এই দানায় ঘরে।”

বিকাশ অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, “তোমরা আমার বলছ বটে যেতে, কিন্তু...”

কথাটা শেষ করিতে প্যুরিল না, কারণ সে ঘরে প্রবেশ করিতেই বাবা হঠাৎ মুখ ঘুরাইয়া কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া রহিলেন, বাবার বন্ধ লোকনাথ বাবু অভ্যন্তর বেশিরকম মাথা গুঁজিয়া মাদুরটার উপর আঙুল দিয়া একটা ‘৪’ মল্ল করিতে লাগিলেন, এবং কাকা ভীক্ মনোযোগের সহিত সেই আঙুল চালানো লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

জান ছাত্তের আঙুলে হঠাৎ গরম লাগায় বিকাশ কারণটা বুঝিল, ক্ষুণ্ণের চোটে অজ্ঞানত হইয়া হাতে সিগারেটগুচ্ছই চলিয়া আসিয়াছে।

একটু পরে কাকা মাথা না-তুলিয়াই বলিলেন, “হঁ, কি বলছিলি বল ?”

সে ভাবার পূর্বেই ভাঙেল ছোড়া থেকে পা গলাইয়া লইয়া নিঃশব্দে সরিয়া পড়িয়াছে।

হোকরা কাল বস্তুরবাড়ি বাইবে। আজ সকাল থেকে ক্রমাগত এইভাবে করিত-বাস্তব নানা প্রয়োজনে চরকিখোরা ঘুরিতেছে, আর পদে পদেই যারায়ক রকম তুল করিয়া বলিতেছে। নূতন সম্পদ,—মাথা ঠিক রাখা দায় হইয়া পড়িয়াছে।

মা রান্নাঘরের দাওয়ার কুটনা কুটিতেছিলেন। বিকাশ নিকটে গিয়া মুখটা তুলিয়া গোহের করিয়া বলিল, “তোমরা জিদ করছ বটে আমার বাবার প্রভে, কিন্তু...”

শৈল দরকারি-কোটার শিকানবিশি করিতেছিল, আড়চোখে চাহিয়া লইয়া বলিল, “কিন্তু, আমার পায়ে কুতো নেই।”

বিকাশ চট্টোয়া উঠিয়া বলিল, “দেখছ মা, চূপ করুক ভোবার বেয়ে বলছি, নইলে...”

শৈল হঠাৎ ঠেলিয়া একটু পিছনে সরিয়া বলিল, “নইলে কুতো পেটা করবো ওকে।”



‘ভোবার আবার বলছ বটে যেতে...’

মা ধমক দিয়া বলিলেন, “খান্ শৈলী, বড় তাই হয় না ?”—পুত্রের পানে চাহিয়া বলিলেন, “জিৎ করে কি অস্ত্রায়টা হয়েছে ?—খোড়ের পর বাসুনি, তাদের একবার দেখতে সাধ হয় না ?”

“সাধ হয়ে মাথা কিনেছে ; আর একটি দিন বোটে সরয়, অথচ...না, সাতপুরুষে কেউ বের আবাই না হয় বাবা ! সাতেরবের দেখ...”

মা মুখ তুলিয়া রাগিয়া বলিলেন, “কেন, ওদের খন্তর-জামাই হয় না ?”

তরুণী দিকে বক্র দৃষ্টিকেপ করিয়া বিকাশ কহিল, “শৈলী, তোমার মুখটোপ হালি আমার সহি হয় না, হাসবি তো পাষ্ট করে হেসে দেখে—কি মজাট করি।...খন্তর-জামাই হয়, কিন্তু...ফের শৈলী!...আমি কিন্তু মা, বাবার সোঁ মাকাতার আমলের শাল গারে দিবে বেতে পারবো না,—তা বলে দিছি।”

মা আবার ঐশ্ব্য করিলেন, “কেন ভনি ?”

শৈল উঠিয়া আরও দূরে সরিয়া বলিল, “সামেব জামাইরা গারে দেয় না।

বিকাশ একটা পাতাহীন দীর্ঘ লাউডাটা তুলিয়া লইয়া সুবিধা খুঁজিতে লাগিল। মাকে বলিল, “হ্যাঁ, কোথায় একটু হাত-পা ছড়িয়ে ব’সবো, ন ক্রমাগত কাঁধে পিঠে জড়িয়ে—জড়িয়ে—জড়িয়ে...”

শৈল দূর হইতে সুনিশ্চিন্তাবে লাউডাটা লক্ষ্য করিতেছিল। বিকাশ বলিল, “আচ্ছা বা, কিছু বলবো না,—যদি ও ঘর থেকে আমার ত্রাণ্ডেল-জোড়টা আস্তে আস্তে এনে দিস্।...কি ভুলটাই বে করে বলেছিলাম, মা... দেখ, তুলের কথা মনে পড়ে গেল,—ভাগ্যিস্।”

ব্যস্তভাবে উঠিতে উঠিতে বলিল, “ছোট আবার ভেনোর দোকানে ; এই একুশি রোখান থেকে এলাম ! কাল যদি গাড়ি ধরতে পারি তো কি বলেছি ; —টিক শেব সময়টিতে মনে পড়বে কি একটা ভুলে বসে আছি ; অথচ কেউ যে একটা কথা মনে করিয়ে দিবে উপকার করবে...”

মা চারিদিকে খুঁজিতে খুঁজিতে বলিলেন, “ডাটাটা কোথায় গেল গেলি ?”

উঠানের মাঝখান থেকে বিকাশ বিরক্ত ভাবে বলিল “হ্যাঁ, খুব পেছনে ডাকো এর ওপর ; জাঁটা আমি কাঁচা চিবিয়ে ধরেছি...”

মা সুরিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “অবাক কাণ্ড করলি, ডাটা বে তোর দলার জড়ানো। ঐরকম ভাবে সদর রাস্তা বেয়ে দোকানে বাবি ?... দেখতো !”

বোধহয় কুরসতের অভাবেই অপ্রতিভ, মা হইয়া কাঁধ থেকে ডাটাটা নামাইয়া ছুঁড়িয়া কেলিয়া বলিল, “শাল-জড়ানোর কথা বলতে গিয়ে ম্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল। বাবার শালটা ভুলে রেখো, মা ; এই থামেই ঐরকম ভুল হচ্ছে, নিরে সেলে কী বে কাণ্ড হবে !—ওর আঁচলার চকড়া কালো লতার-পাতার আমার মাথা শুণিয়ে বার, আবার না দেখেও থাকা বার না,—কি সোলবেলে কাণ্ডকারখানা বলে দিকিবা !—একটা পাতা

একি বিয়ে বেরিয়ে অত একটা পাতার বড়ো কিসের সঙ্গে জড়িয়ে... তার ওপর একটা ফুল এসে পড়েছে—বাকখান দিয়ে একটা চক্কর লতা... ফুলটা না পোলাপি, না শর, না ধৌ—বত মনে করি ভাববো না, ততই বেশ সবজলো মাখার কিসকিল করতে থাকে।—তুলে রেখো না, আমার হাঁসিরা-ওলা শালে কাক নেই।”

মুরিয়া একরকম ছুটিয়াই আবার বরকিয়া দাঁড়াইল; কপালে ভরলী চাপিয়া বলিল, “দেখ, বললাম কিনা ?—কি যে তুলে গেছলাম বিলে তুলিয়ে !” “ভেনোর দোকানে তো যাচ্ছিলি।”

“সে কে না জানে, কিন্তু...”

শৈল নিজে আসিল না,—বাপ-খুড়াদের কথার কোড়ন মিটেছে। হোষ্ট ভাইয়ের হাতে চটিছোড়াটা পাঠাইয়া দিয়াছে। সে আসিয়া দাদার দিকে জুতা দুইটা উঁচা করিয়া দাঁড়াইল। বিকাশ অজমুনকভাবে সে দুটা বা হাতে লইয়া কতকটা স্বগতভাবে বলিয়া উঠিল, “হয়েছে !...স্লিপ—সেক্টিপিন্—সেক্টিপিন্—ভরল আলতা—মো—আর কি লিখেছিল ?...”

শৈল আসিয়া উপস্থিত হইল, আকারের স্তর করিয়া বলিল, “কার এমো, দাদা ? আমার অস্ত্রও একটা এনো না...”

তাহার কথায় বিকাশের হ'ল হইল—মার সামনেই বউয়ের পাঠানো ফদটা আঙড়াইয়া বাইতেছে। চাহিয়া দেখিল বা মিটিমিটি হাসিতেছেন, পুত্রের অবস্থা দেখিয়া মুখ উঠাইতে পারিতেছেন না।

বিকাশ একরকম ছুটিয়াই পলাইতেছিল; বা না ভাবিয়া পারিলেন না, “ওরে, জুতোছোড়াটা পারে দিয়ে নে ; কি হ'ল ছেলের গো ?...”

বিকাশ মুরিয়া দাঁড়াইয়া আগাইয়া আসিল। একজনের উপর কাল বাড়িতে পারিয়া যেন বর্তাইয়া গেল ; বলিল, “শৈলী, গেছিস্ তো তুলে ? না, সিলে কেলেছিল ?—দাদার ত্রাণে বড় মিটি কিনা...”

শৈল দুয়েই ছিল, বলিল, “তাই বর করে পকেটে পুরে রেখেছি।”

বিকাশ পকেটের দিকে লক্ষ্য করিয়া অপ্রতিত বিষয়ের লিঙ্গ বলিল, “কখন এমো !”

কিন্তু অল্পসন্ধানের অত অপেক্ষা করিবার তাহার আর অবস্থা নাই। পকেট হইতে জুতাছোড়াটা তুলে কেলিয়া আঙুলের তপস চামিতে চামিতে দ্রুত ব্যাহির হইয়া গেল।

খাইতে বসিয়া ক্রমাগতই আহার-বিভ্রাট ঘটতেছে। মা প্রশ্ন করিলেন,
“হ্যারে, খত্তরকে চিঠি দিয়েছিস্ তো ?—ক’দিন থেকে তোর যা হয়েছে...”

শৈল বলিল, “কাকা দিয়েছেন কাল ; ওর ভরসাভেই আছে কিনা সব !”

বিকাশ হঠাৎ হাত ছুইটা গুটাইয়া সিধা হইয়া বলিল ; চোখ ছুইটা
কপালে তুলিয়া বলিল, “সর্বনাশ !”

মা কিংচিংমাত্রও বিমিত্ত না হইয়া বলিলেন, “কি হ’ল ?”

“খত্তরের কথাই মনে পড়ে গেল,—গায়েবকে এখনও দরখাস্ত পাঠানো
হয় নি। জীবন নন্দীও সাড়ে দশটার পাড়িতে চলে গেল।—ঠিক চাকরিটি
বাবে। দেখি ; যদি ডাকটা ধরতে পারি...”

মার দিঘি দেওয়া লস্কের উঠিয়া পড়িয়া আঁচাইতে আঁচাইতে শৈলকে
বলিল, “যা তো, লক্ষী দিদি আমার, সাধন ডাক্তারের কাছ থেকে সাটি-
ফিকেটটা নিয়ে আয় তো—পরশুই বলে এসেছি, অথচ যে নিয়ে আসবো
একবার গিয়ে,...যা, এমন কথা শোনে শৈলস্বামী...”

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, “আবার ডাক্তারের সাটিফিকেট কেন ?”

“হ্যাঁ, সোজা কথাই দুটি দেবে কিনা ?—সাধনকে বললাম, লিখে
দেবে—বাস্ থেকে পড়ে গিয়ে পা’টা সাংঘাতিক রকম মুচ্কে গিয়েছে...”

মা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “দেখ কাণ্ড !—বালাই, বাট !—শক্তর পা
মচ্কাচ্...”

“শক্তর পা মচকালে আমার ছুটি দেবে কেন ?”—বলিতে বলিতে তাড়া-
তাড়ি ছুটা কুলকুচি করিয়া ঘরে ঢুকিল।

দরখাস্তটি আর শেষ হইয়া আসিয়াছে, শৈল আসিয়া উপস্থিত হইল।
হাতে দুইটা ভাঁজ-করা কাগজ, একটা ডাকের খাম। একটা কাগজ
বিকাশের হাতে দিয়া বলিল, “সাধনদা’ দিলে।”

সাটিফিকেটটা পড়িয়া মুড়িয়া রাখিয়া বিকাশ দরখাস্তর বাকিটুকু শেষ
করিতে লাগিল।

শৈল পিছনে একটু হাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর সাহস লব্ধ করিয়া
বলিল, “বাবা, এই খামটার ঠিকানাটুকু লিখে দেবে ?—বৌদিদির...”

বিকাশ মিরক্তভাবে বলিল, “যা বা, জ্বালাতন করিস্নি কাজের সময়।”

আহার-পর আবার কি ভাবিয়া ফিরিয়া চাহিল ; জিজ্ঞাসা করিল, “তা ও
টিকিট-বেওয়া খাব কেন ? আমি তো বাচ্ছিই ; আবার বুদ্ধি বিবাল হইল না ?”

শৈল অহুযোগের নাকী ঘুরে বলিল, “তুমি বড় ভুলে যাচ্ছ ক’দিন থেকে ; তাই বাবু ডাকেই পাঠিয়ে দিচ্ছি।”

বিকাশ আবার লিখিতে ব্রুক করিয়া বলিল, “অ গোড়ার ঘুঁষী!—বা, আমার দ্বারা হবে না... ‘বড় ভুলে যাচ্ছ’!”

একটু পরে শৈল তখনও পিছনে ঠাড়াইয়া আছে অহুতব করিয়া বলিল, “রেখে বা, যখন ফুরান্ হবে লিখে দোব।”

শৈল তাহার চিঠিটা আর খামটা সাধনের সার্টিকিফিকেটের সঙ্গে রাখিয়া আর একবার অহুরোধ করিয়া চলিয়া গেল, “হু’টি পারে পড়ি দাদা,—আহা, বৌদি বেচারি উত্তরের অস্ত্রে হা-পিত্তোশ করে আছে গো।”

‘সে বেচারি’ কিসের অস্ত্র যে হা-প্রত্যাশা করিয়া আছে তাহারা বিকাশ মনে মনে একটু হাসিল। সেই সরসতার বশে খামটাতে বধূ নামটা লিখিল, ঠিকানাটা লিখিল, তাহার পর আকিসের খামটাতে ঠিকানাটা লিখিতে বাইবে, বাহিরে ডাক পড়িল, “বিকু আহিস্?”

বিকাশ প্রশ্ন করিল, “কে? সাধন নাকি?”

“পেয়েছিস্ সার্টিকিফিকেটটা?...দেখো, পেখানে গিয়ে যেন সত্যি সত্যি ঝোড়া হয়ে বসে থেকে না, আমাদের কাছে আবার ফিরে এসো ভালোর ভালোর।”

বিকাশ হাসিয়া প্রশ্ন করিল, “কোথায় যাচ্ছিস্?”

“একটু পোস্টাফিসের দিকে।...আচ্ছা, আসি—একটু তাড়া আছে।”

বিকাশ অস্তভাবে বলিল, “একটু ঠাড়া তাই, হাক্-এ-মিনিট্।”—তাড়াতাড়ি দরখাস্তটা মুড়িয়া তাঁজ-করা কাগজের একখানা তাহার মধ্যে রাখিয়া ধামে গুরিল, মুখটা বন্ধ করিতে করিতে বলিল, “এই এলাম বলে—এক সেকেন্ড...”

কি মনে হইল, শৈলর দেওয়া ধামেও অস্ত তাঁজ-করা কাগজটা ভরিয়া বন্ধ করিল, তাহার পর বাহিরে গিয়া দুইটা চিঠি সাধনের হাতে দিয়া বলিল, “একটু কেলো দিস, বড় আর্জেন্ট।”

সাধন খামটার উপর মজর বেলিয়া হাসিয়া বলিল, “নানে—‘বুর্হা’ যেওনা—আসছি?”

বিকাশ হাসিয়া উত্তর করিল, “ভূটা শৈলীর; আমারটা মিচে, আকিসের ঠিকানায়, তার বক্তব্য—‘বরণে সব কলরপিন্দে, শরী এখন পাঁচ দিন আসছে না’।”

বি-পি. রেল হইয়া বাইতে হয়। গাড়ি স্টেশনে প্রবেশ করিতেই খণ্ডরকে অগ্রণী করিয়া একটি মাঝারিগোছের দল স্ট্রাটকর্ষে জরিয়া উঠিল,— হু'টি শালা, তিনটি ছোট ছোট শালা, একজন খুড়কুতো তারঙ্গাঙাই, আরও তিন চারিটি নতুন মুখ—বিকাশ চিনিতে পারিল না। দেখিল সবাই মুখেই দারুণ উৎসেগের চিক; সে হাসিতে গিয়া তাড়াতাড়ি মুখটা বিবর করিয়া লইল, মনে মনে ভাবিল—“এ আবার কি ব্যাপার।”

নারিতে বাইবে, খণ্ডর তাড়াতাড়ি, “হাঁ-হাঁ, ঠাড়াও বাবাজি, ঠাড়াও!”— বলিতে বলিতে গাড়ির ঘোরের কাছে গিয়া তাহার ডান হাতটা শক্ত করিয়া ধরিয়া ফেলিলেন; বড় ছেলেকে বলিলেন, “তুই বা হাতটা ধর, ভালো করে—দেখিস্...এইবার নাবো বাবা; দেখো, যেন হ্যাচকা-ট্যাচকা না লাগে। ঠিক হয়েছি-তো আমরা? জোর পাচ্ছ? খুব আন্তে পা বাড়াও।”

বিকাশ মনে মনে বলিল—“হরেক্, এ পোড়ারমুখী শৈলীর কাজ; কালকের চিঠিতে নির্ধাৎ সার্টিফিকেটের কথাটা লিখে দিয়েছে।”...কিন্তু তখনই মনে হইল, তাহা হইলে তো যাত্র এইটুকু প্রকাশ পাইবে যে সে অক্সিকে প্রবক্তা করিয়া খণ্ডরবাড়ি আসিতেছে।...কিন্তু ওহাইয়া তাবিবার সময়ও নাই—খণ্ডর-শালার তাহাকে একরকম টাঙাইয়া ধরিয়াই তাহার নামিবার অপেক্ষা করিতেছে। খণ্ডরের প্রেমে বিকাশ উত্তর করিল, “আজ্ঞে হ্যা, পাচ্ছি।”—অসংগতির তরে আওরাজটাও সাধ্যমত কণ করিয়াই বলিল।

হুইজনে ধরিয়া ধরিয়া তাহাকে খানিকটা দূরে লইয়া গেল; তারপর তাহার বলিষ্ঠ শরীরের গুরুত্বের অস্ত্র যেমন যেমন তাহাঘের হাত তারিয়া আসিতে লাগিল, বিকাশও নিজের শারীর উপর নির্ভরতা বাড়াইয়া দিতে লাগিল। সেটা অহতব করিয়া খণ্ডর একটু আশ্চর্যভাবে প্রশ্ন করিলেন, “খুব বেশি তাহলে লাগেনি বাবাজি, নয়?”

“আজ্ঞে না, ভতটা লাগেনি।”

“অগত্যা বন্ধা করেছেন; কিরকম করে চোটেটা...?”

বিকাশ বোঝ হয় নিরুপায়ভাবে বোটরের কথায় বলিতে বাইতেছিল, ছোট শালাটি প্রেরের উত্তর দেওয়া থেকে বাঁচাইল—বহিও আরও এক ভক্তের নকড়াই আনিয়া ফেলিল। হঠাৎ বিজ্ঞাসা করিল, “কোনখানটার লেগেছে, জাবাইবাবু?”

সম্পদের বিপদ

বড়শালা ধমকাইয়া বলিল, “তোমার সে-কথার কাজ কি হুটকি ?—
আ বড়।”

বিকাশ-স্বস্তির নিবাস যোচন করিল।—আসলে, এত অল্প সময়ের মধ্যে
কোথার যে লাগিয়াছে সেটা তাহার ঠিকই করা হয় মাই এখনও ; বলিলেও
একটা ফুলো কি আঁচড় দেখাইতে হয়, না-হইলে আকিস-প্রবন্ধনার ব্যাপারটা
বড় বিস্মিতাবে স্পষ্ট হইয়া উঠে। সময় পাইয়া সে এই নববির বিপদ হইতে
উদ্ধারের পথ খুঁজিতে লাগিল।

একটা গরুর গাড়ি অপেক্ষা করিতেছিল। অতিরিক্ত বস্ত্র এবং উৎকর্ষিত
প্রাঙ্গাদির ভয়ে বিকাশ নিজে হইতেই খুব সাবধানে আরোহণ করিল। স্বস্তর
প্রভৃতি কয়েকজন সঙ্গে রহিল, বাকি সকলে হাঁটিয়াই চলিল। মুখটা আর
বিকাশকে চেঁচা করিয়া বিষয় করিতে হইল না, বিষয়ে এবং চুস্তিভার আপনিই
নিশ্চয় হইয়া রহিল। একটু পরে স্বস্তর সামান্য একটু তাতিলেন কথাকাটা,
কিন্তু তাহাতে ব্যাপারটার চারিদিকে কুহেলিকা ঘনীভূতই হইল মাত্র।—

“তোমার শাস্ত্রী তো কেঁদেই খুন—বলে, ‘কেন যাক্স বাপু ইন্সিষ্টানে বটা
করে—বাছা কি আমার আসতে পারবে ?’—আবারও তাই বনে হুজিল,
তবুও সাহস দিয়ে বললাম,—‘তার খুড়োর চিঠি পেয়েছি বিকাশ আসবে,
আজ সকালের এ চিঠিটা কিছুই নয়’...বললাম বটে ‘কিছু নয়’—এদিকে
কিন্তু আমার নিজেরই খটকা লেগে আছে—যাক্সা লিখতেই বা গেল
কেন আবারের কথাটা ?...”

বিকাশ বাড়ী ধাক্কাইয়া স্ত্রীলোককে কিস্কিস করিয়া বলিল, “কৈ, আমার
তো একেবারেই কিছু লাগে নি। বনেই পড়ছেন। বে...”

স্ত্রীলোক প্রশংসার মুহূর্ত্ত করিয়া বলিল, “আপনার হ’ল কুটমল-খেলা
হাড়, ওসব চোটকে বড় একটা আমল দেন কিনা !”

বিকাশ নিরাশ হইয়া চুপ করিয়া গেল, বুঝিল আপাততঃ স্ত্রীলোকের
ভরীপতি-গৌরব ডিঙাইয়া প্রকৃত কথাটা বুঝিবার বা বুঝাইবার চেষ্টা
বৃথা।

ভায়রাতাই মুখটা আগাইয়া আনিয়াছিল ; বিজয় দর্শে কিস্কিসানিতেই
বিলম্ব বোগ করিয়া স্ত্রীলোককে বলিল, “আমি বললাম না—ওটা ঠাট্টা ? সময়ে
আজকাল ঐ সব ধরনের ঠাট্টা চালা। কে লিখলে, কি অব্য, এটা যদি চট
করে ধরাই পড়লো তো আর কথাটা কি হ’ল ?...কি বকুন বিকাশ-বা ?”

ধরা না-পড়িবার মজা বিকাশ হাড়েহাড়েই অনুভব করিতেছিল, স্পষ্ট কিছু না বলিয়া একটু হাসিল যাত্র। ভাররাতাইকে একটু স্বপক্ষে পাইয়া প্রকৃত ভাষাটা বাহির করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি তাহ’লে পড়েছিলেন চিঠিটা মদনবাবু ?—কি লেখা ছিল বলুন তো ?”

ভাররাতাইটি বাহাকে বলে একটু আচ্ছাদে গোহের। সৌজন্তে গদগদ হইয়া বাড় বাকাইয়া বলিল, “আমাকে ‘আপনি’ বলে লজ্জা দেওয়া কেন ? আবার মদন বা—বু !—বাবু !”

সৌজন্তের চাপে দরকারি কথা মারা যায় দেখিয়া বিকাশের মুখটা বিরক্তিতে কুঞ্চিত হইয়া আসিতেছিল, সামলাইয়া একটু হাসিয়া বলিল, “তা’তে কি হয়েছে ? বলুন না।”

ভাররাতাই একটু দোল খাইয়া আদ্যারের সুরে হাসিয়া বলিল, “না, কখনও বলবোনা ; আগে ‘তুমি’ বলুন...”

বিকাশ তাহাকে মনে মনে ‘তুমি’র চেয়ে ঢের নিম্নস্তরের শব্দে অভিহিত করিয়া তাহার সঙ্গে গোটাকতক অকথ্য গালাগালও জুড়িয়া দিল। এ অবস্থায় যতটা সম্ভব হাসিমুখ করিয়া বলিল, “আচ্ছা, তুমিই না, চিঠিটা পড়া হয়েছিল কিনা ?”

“ঐ দেখুন, এড়িয়ে গেলেন ; ভারী চালাক, ইস্ !”—বলিয়া ভাররাতাই নিজের চতুরতার হাসিয়া উঠিল।

গোড়া থেকেই মন ভালো নয়, তাহার উপর এই ভ্রাকামির আচরণ,—বিকাশের ডান হাতটা একটা শক্ত মুঠার পাকাইয়া উঠিল। ভাররাতাইয়ের প্রার্থিত অনৌজন্তটা কোথায় গিয়া পৌছিত বলা যায় না, যত্নের কথায় ব্যাপারটা অন্তরিকে ঘুরিয়া গেল।

বলিলেন, “নেবে বাড়িতে ঢোকবার সময় বাবাভী, যতটা পারো সহজ ভাবে চলবার চেষ্টা করো, নাহ’লে তোমার শান্তকী—এরা কেঁদেকেটে অনর্থ করবে ; অথচ আবার যেন এমন ভাবে লুকোতে যেও না, বাতে, আররা ব্যাড়া জানি, তাদের ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়। বুঝলে তো ?”

বিকাশের একবার মনে হইল—এই শেব সুযোগ ; আরম্ভও করিল, “কিন্তু বাবা, আমার বখন...”

যত্নর মুখের কথা বাড়িয়া বলিলেন, “হী বাবা, যা বলবে তা’ বুঝেছি বইকি।—তবল আর কি করবে ?—নিরুপায়—”

বিকাশ হতাশভাবে মৌনতা অবলম্বন করিয়া স্বত্ত্বের কথা মনেটা বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এমন সময় একটা বোড় ঘুরিয়া গাড়িটা বাড়ির সদরে হুইটা ধানের মরাইয়ের মাঝখানটার আগিয়া হাজির হইল।

এক পাল নানাবয়সের স্ত্রীলোক, ছোটবড় অনেকগুলি ছেলেমেয়ে—বোঁড়া বয় দেখিবার উৎসাহে যে দলটা একটু বেশিরকম পুক হইয়াছে, বেশ বোকা যায়। সকলের মুখটা আশা এবং উৎসুক্যে বেশ দীপ্ত হইয়া আছে।

মাঝখানে শান্তী,—অকলে মুখ, নাক আর চোখের খানিকটা ঢাকিয়া পূর্ব হইতেই কাঁদিতেছিলেন। স্বামী আর পুত্র নামিতেই কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আর নিজেকে সাইলাইতে পারিলেন না : “জোড়ের পর স্বত্ত্ববাড়ি এলো বাছা কিনা খোঁড়াতে খোঁড়াতে !”—বলিয়া এমন উচ্ছ্বসিতভাবে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন যে তাহার অন্নমাত্রই চাপা থাকিতে পারিল।

স্বামী একটু বিরক্তভাবেই বলিলেন, “ওগো, না গো না, তেমন কিছু লাগেনি ; কৈ খোঁড়াচ্ছে ?—দেখ দিকিন চোখ মেলে ?...”—বলিয়া গাড়ির পিছনে দাঁড়াইয়া খুব লতকদৃষ্টিতে বিকাশের পারের দিকে চাহিয়া রহিলেন। খোঁড়ার কিনা দেখিবার জন্য চারিদিককার দলটা আরও আগাইয়া আসিয়া বিকাশ যেখানটার নামিবে সেখানটা ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ভিড়ের মধ্যে বেশ একটু ঠেলাঠেলি পড়িয়া গেল।

বিকাশের নামিতে একটু দেরি হইতেছিল, হইবারই কথা, কেননা খুব সহজ, সুস্থ পায়ে জোর করিয়া সহজভাবে চলিবার মতো শক্ত অভিনয় আর নাই, বিশেষ করিয়া এতগুলি সমালোচকের সম্মুখে। তাহার উপরও বিপদ এই যে, কর্মাসী ‘সহজ’-এর মধ্যে কতটা আবার ল্যাংচানো তাব বিশাইলে ওদিকে স্বত্ত্বমহাশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িবেন না—সেদিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই ব্যস্ত হইয়া পড়িবার মর্মও তাহার অজ্ঞাত ছিল না—অর্থাৎ একেবারে বেপরোয়া ভাবে চলিতে গেলে সেটা কৃত্রিম তাবিয়া স্বত্ত্ব, শালা মরাই আসিয়া তাহাকে আবার টাঙাইয়া তুলিবে। স্বত্ত্ব-শান্তীকে একদমে লুপ্ত করার এই দারুণ চুড়ান্ত পড়িয়া বিকাশ একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল, শান্তী করার আর একটা উদ্দ্যানে তাড়িয়া পড়িয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, “বাছা আবার বে নাহতে পারছে না গো !—এগিরে ধরো না গিরে ? তোমারও কি এটা তাবালা সেববার সময় হ’ল।

বিকাশ সহসা আবার কি ভাবিয়া যেন সরিয়া হইয়াই একটা কাণ্ড করির বসিল।—সাতাষা আসিবার পূর্বেই একরকম লাকাইয়াই বাসিয়া পড়ি। এবং সাধ্যমত জড়তাটা কাটাইয়া শাওড়ীকে সিয়া প্রণাম করিল। তাহার পরে বেশ সিধা হইয়া পাড়াইয়া উঠিয়া বসিল, “আমার তো যা কিছুই হয়নি এই দেখুন না ; আপনারা মিহিমিহি ভাবছেন।”



‘বাহা! আমার বে মাথতে পারছে না গো!’

বড় হঠাৎ হইয়া সেল বসিয়া ঘোষ হয় খবর “ব্যক্ততার” কোন লক্ষণ দেখাইবার অবসর পাইলেন না, যেন যেন তবু জানাইয়ের কর্তব্যকৃত্যের প্রণো করিলেন—আহা! তাহারই উপবেশ পালন করিবার চেষ্টায় এই মিথ্র তো! শাওড়ীও হুঁকিলেন আবাই তাহার হুঁকিরা লাব্য করিবার অত হাসিকর আশ্বনির্ভর সহ করিতেছে—আহা, এমন আবাই! চোখে জ্ঞান

বজা নামিল, বলিলেন, “তাই হোক বাবা, আমাদের ভাবনা বিচ্ছেদ হোক... কি করে লাগলো বাবা, বিকাশ? হাড় কি স্থানা হয়ে গেছলো? কবে হাসপাতাল থেকে ফিরলে সেখানে?...”

আর বলিতে পারিলেন না, উজ্জ্বলিত অশ্রু চাপিতে চাপিতে হাত ধরিয়া আঁতে আঁতে আনাইকে চালাইয়া লইয়া চলিলেন। বিকাশ একেবারে হাল ছাড়িয়া দিল।

কর্তা উন্ন হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, “হাড় স্থানা হ’তে দাবে কেন? ভালো জালাতন! আর হাসপাতালে গিছলো এ খবর আবার কে দিলে তোমায়? হাড় স্থানা হয়ে গেলে ওরকম চলতে পারবে কাকে? না, বাড়ি ছেড়ে এতদূর...”

হঠাৎ কি তারিরা চুপু করিয়া গেলেন।

গিন্নী অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলিলেন, “তুমি ক্যামা দাওতো বাপু; পাবাণ!...— তোমার ভয়ে ছেলেটা ভালো করে সহজভাবে চলতে গিয়ে কি কষ্টটাই বৈ সহ করছে তা বোকবার তোমার ক্যামতাই নেই!”

দাঁড়াইয়া বলিলেন, “না বাবা, তুমি খুঁড়িয়েই চলো একটু, আমার মাথা খাপ। পা-ধন বড় ধন, অবরদত্তি করে কাজ নেই কাজের ভয়ে। আমার অদিতে যখন নেকাই আছে আজ এই দেখবো, তখন তুমি আর কত সামলাবে বাবা?”

ভারসাতাই আগাইয়া আসিল এবং তাহার আসল অভিন্নতা বাহাই হোক, আপাততঃ বিজয়ের মতো মাথা নাড়িয়া বলিল, “তবু বে এমন পা নিরেও এসেছেন আমাদের মনে করে...”

বিকাশের চোখে দৃষ্টি পড়ায় ধামিয়া গেল।

ছেলের দল নিরাশ হইয়া পাতলা হইতেছিল, একজন ছুটিয়া বাহির হইয়া চাপা গলার বলিল, “এই! দেখলে সব, এবার খোঁড়াবে, নাজাপুড়ী দিকি দিয়েছে...”

কর্তা ধমক দিয়া উঠিলেন, “তোরা বা দিকিন্ সব,—তারালা পেয়েছে... শোন কথা,—তবে খোঁড়াছে না! তাহ’লে তবে তুমি কান্নাও বন্ধ করে দিতে...”

গিন্নী সহানুভূতিতে ক্রন্দন একজন বয়সীকে কহিলেন, “দেখছো? এটা কান্নাঝিবি?—এইটে বঙ্গভার সময় হ’ল—মোরে খবর আনাই!...—বুঝলে কি হবে?—বেল থেকে কি করে বে চায়দালা করে বালে-মোটা দিকে এসেছে, তা কি...ও মাটোঃ”

আবার খানিকটা অপ্রনিকশ করিয়া বুকটা হাত্তা করিয়া বলিলেন, “চলো বাবা, ভাঙা পা’টিকে আনুগা করে চলো...”

বিকাশ শৈলর উপর মনে মনে “গজ হিঁতেছিল—বাড়ি ফিরিয়া তাহাকে আন্ত পু’তিবে। কিন্তু আপাততঃ যখন উপায়ই নাই, তখন কি তাবে কতটা আনুগা করিবে পা’টাকে তাহাই ভাবিতে লাগিল। শান্তী বলিলেন, “চলো বাবা ; কাত্তদিদি, তুমি নাহয় ভাই ওদিকটা ধরো...হ্যাঁ...এইবার চলো তো ধন আমার...আহা, জোড়ে এসে কেমন হাসিমুখে কিরে গেল বাছা আমার, আর আজ বাছার শুকনো মুখখানির দিকে চেয়ে যে চাইতে পারা যাচ্ছে না গো।”

শ্যারভাতাই জোঁঠশান্তীদীর সাহায্যে আসা সমীচীন বোধ করিল। সামনে আসিয়া বলিল, “চলুন না বিকাশদা ; নিজের বিয়ে-করা খণ্ডরবাড়িতে নেংচে নেংচে ঢুকবেন, তা’তে লজ্জা কি ? এতো আর—এতো আর...”

কোথার ল্যাংচোনার লজ্জা হওয়াটা স্বাভাবিক তাহার একটা সুংসই উদাহরণ না পাইয়া থামিয়া গেল। তারপর নিরুপায় বিকাশ খোঁড়াইতে আরম্ভ করিলে উৎসাহিত করিবার জন্য দক্ষিণ হস্তের চেটোটা তালে তালে ঘুরাইয়া বলিল, “এই তো, বাঃ ! আর আপনি তো আর সাধ করে খোঁড়াচ্ছেন না বিকাশদা, যে...আর জোঁঠাইয়াও মনে করছেন ঘরের ছেলে ঘরে তুলছি...”

চোকাঠের নিকট আসিতে শান্তী চোখ মুছিয়া দ্বেহকড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, “লোয়াস্তি পাছ নাকি বাবা ?”

বিকাশ শ্রান্তকণ্ঠে বলিল, “অনেকটা।”

দ্বিতীয় বুকটা একটু কুঁকিত করিয়া পাবাশহদর স্বাধীর দিকে একটা কটাক্স হানিলেন।

* * * *

প্রথম অভ্যর্থনার হিড়িকটা কাটিয়া গেলে কথাবার্তার বিকাশের নিকট অবশ্য আসল ব্যাপারটা ক্রমশঃ প্রকাশ হইয়া পড়িল।—আজ দুপুরের ডাকে শৈলর চিঠির পরিবর্তে সাধনের সার্ভিকিটেকটো আসিয়া হাজির হইয়াছে। ইহাতে শৈলর উপর হইতে বোবটা সরিয়া বাওয়ার বনটা আরও বেশ তিক্ত হইয়া উঠিল। একবার তাবিল,—“সাধন হুতজাখাটা টিক সেই ভালের মাথাটিতে এসে যদি ভাড়াহুড়া করে খাবের সোলমাল না বাবিরে দিত...”। কিন্তু তাহাতেও হারী সাধনা পাওয়া গেল না। ওদিকে আবার অ্যুকিয়ে

গাটিকিকেটের পরিবর্তে শৈলর চিঠি গিয়া কি অবটন খটাইতেছে তাহাই বা কে জানে ?...

এখানে পত্রটার অসংগতি বরিবার-অতো বখন কাহারও ঘটে বুঝি নাই, তখন সে আর সোকার তুলটার কথা ভাবিল-না। শুধু বলিল, “সামনের এ ডাক্তারিগিরি কল্যাণে বাওয়া কেন ?...নতুন পাশ করেছে কিনা—তাবলে আনিয়ে খুব বাছাই করলাম।—একটু লেগেছিল সারাভ, তাবলাম সেখানে থাকলেই তো খেলাখুলা, আফিস,—তাই হু’টো দিনের ছুটি নিয়ে এলাব চলে।”

শান্তী গোখ মুছিয়া বলিলেন, “বেশ করেছে, বাবা।”

ভায়রাভাই বলিল, “আর বাড়ি আর খত্তরবাড়ি কি আলাদা, তাবতে আছে ?—বলুন না ছোটাইয়া।—কথাতেই তো বলে, যে...”

কি যে বলে মনে না পড়ায় চুপ করিয়া রহিল।

খত্তরবাড়ির অত সাধের আদর-যত্ন—সব জড়ো হইয়াছে ডান পাঠের হাঁটুতে। জামাইয়ের বাকি সবখানি পড়িয়া গিয়াছে দারুণ অবহেলার। মনে লুথ নাই মোটেই।

খোঁড়ানোটো ক্রমে ক্রমে কমাইয়া আনিয়া পরের দিন সন্ধ্যাবেলা বিকাশ বলিল, “কালই তবে যাই, আফিসের ছুটিটা পেলাম কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না,—নতুন চাকরি...”

খত্তর বলিলেন, “ডাক্তারবারু লিখেছেন পূর্ণ বিজ্ঞান নিতে এক হস্তা।”

এত দুঃখতেও বিকাশের হাসি পাইল। তখনই আবার তাবিল—অজ চাষাভূষাগোছের খত্তর না হইলে তাহারই ছিল আদ আদ ও লজ্জার পড়িবার পালা।

বলিল, “বলেছিল বটে; কিন্তু না যে কি চমৎকার ওষুধ সব দিয়েছেন, আমার তো আজই যেন পনরো আনা করে গেছে বলে বোধ হচ্ছে,

কতদিন পরে এই যেন একটু সুসুই কথা কহিল।

শান্তী বিন হাত করিয়া বলিলেন, “ও আমার সিঁদিয়ার দেওয়া ওষুধ। এদের একেই হস্তক্ষেপ করেন বলে কি শু বা-জা ?...তা’ কাল আর নয়, পরও তখন বা হয় হবে। চাকরির কথা কি আর বলবো বলে ? কিন্তু খোঁড়া-বাড়া সিঁদিরে আমার একবার এম্বো শীগগির, বাবা...”

বিড়ম্বনা

বরষাজী আসিয়াছে নববীপ হইতে। আর সব যেমন আখচার হয়,—
অস্বাভাবিক রকম তারিকে বরকত! ; শিঙি মাছের মতো কালো, লিকলিকে
নাশিত ; ঝাড়-কামানো চ্যাংড়া, পেশাদারী বরষাজী ছোকরার দল—চারে
এলে না, খোসামোদে গলে না ; বরঙ তোমার-আমারই মতো—মেহাৎ
আটপোরে গোছের। তবে পুরুত আসিয়াছে নাকি মহা এক দিগ্‌গজ পশ্চিম।

মুক্তি মাথার স্পষ্ট শিখা, শীর্ণ দীর্ঘ দেহ ; নামাবলী গারে, খড়ম পারে
অনাচার বাঁচাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। এক একটা সংকত বুলিই বা কি,
জোর উচ্চারণই বা কি ! নস্যতে পর্যন্ত যেন একটা টুলো সংকত-সংকত
সুক নাকে ঠুসিয়া দিয়া হাতে তালি দেন—যেন বিসর্গ ঝরিতে থাকে।

গ্রামের মাতঙ্গদের আসিয়া আলাপ করিয়া গেল। মাতঙ্গদের মাতঙ্গর
শিবনিবাস, রামচৌধুরীদেব চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া আগে ধানিকটা ডাইনে বায়ে
মাথা হুলাইয়া লইয়া, ঠোটে ঠোট চাপিয়া বলিলেন, “না, ভায়াংকার
বশাইয়ের বিস্তার খই নিতে হ’লে ডুরি নামাতে হয়।”

সকলের মুখ সম্মুখে উজ্জল হইয়া উঠিল ; শিবনিবাসের মুখেই যখন এই
কথা !—এক ইংরেজী কেতাবই বাহার অন্ন করিয়া ধরিলেও তিন চাকখানা
পড়া আছে। হক চক্রবর্তী রামলোচন তর্জীচাৰ্যকে একটু ঝেঁজিয়া বলিল,
“বাও না হে তর্জীচাৰ্, একবার আলাপ-পরিচয়টা করেই এসো না, গ্রামের
মুখ মাথোড়ে তো তুমিই ; অঁত বড় একটা বিচক্ষণ পণ্ডিত এলেছেন...”

সকাল থেকে এই রকম প্রশংসা শুনিতে শুনিতে রামলোচনের মেজাজ
নিত্যন্ত তিরিকি হইয়া ছিল, হঁকা থেকে মুখটা ছিনাইয়া ব্যাক্ ব্যাক্ করিয়া
উঠিল, “আরে ল্যাও ল্যাও ! রেমো তর্জীচাৰ্ ও রকম ডের ডের নেড়াংকার
বেখেছে ; তোমরা দেখনি কখন, ভাংলার মতো ঘিরে বোলো গে।...আমি
যেহেবেতে খেলান কেন হা ? বলে, আমার লিঙ্গকে এক একটা উইয়ের
পেটে বা বিতে আছে তা হইল করতে ওরকম ভায়াংকারের মশটা তুলে
কেটে বার, হাঃ...”

মতাই ভো, হকচর প্রাচীর সভাপতিত্ব করিয়া কামতুঙ্গর বশবর ; লিঙ্গ
ঘুরিয়া যখন ভালপাতার পুঁপি ওকার তখন উইয়ের মাটিই মাটির হয় আদাই

পের করিয়া ! করেরজন সমর্থন করিয়া বলিল, “হ্যাঃ, ঠিকই তো, কেন পারে পড়ে আলাপ করতে যাবে ? বংশমর্যাদা বলে একটা জিনিস আছে তো ?”

প্রসন্ন কবিরাজ রোগীর নাড়ি টিপবার সময় প্রায়ই হ’একটা সংকত শ্লোক আঙড়ায় এবং সেই সূত্রে গ্রামের পণ্ডিতের আসনটা লইয়া তাহার রান-লোচনের সহিত রেবারেবি আছে। উঠিয়াই বাইতেছিল, একটু দূরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “তাহ’লে বিকেলের দিকে কথাবার্তা কইতে কইতে ভাঙ্গালংকার বশাইকে নাহয় তোমার ওখানেই নিয়ে আসা যাবে’খন।”

রামলোচন একটা তির্যক নুটি হানিয়া বলিল, “তুমি বুঝি টের পেয়েছ আমার বৈকালে একবার কানাইদেহে যেতে হবে আজ ?”

“ও !...রাস্তিরে কিন্তু কিরবে তো ?”

রামলোচন কোন উত্তর দিল না, হ’কার উপর বা হাতটা আরও কঠিন ধরিয়া ঘনঘন তামাক চানিতে লাগিল।

উঠানের মাঝখানে টাঁদোরা টাঙাইয়া তাহার নিচে বিবাহ হইতেছে। চারিদিকে লোকের তিড়, কতক বসিয়া, কতক দাঁড়াইয়া। সব বয়সের লোক, তবে যুবকের ভাগ এখন কম ; তাহাদের তিন্ন তিন্ন দলের চর আসিয়া মাঝে মাঝে দেখিয়া বাইতেছে—স্ত্রী-আচারের ধবর পাইলেই তাহারা আসিবে। শাপত্র বন্ধ করিয়া বুড়াদের মধ্যে বসিয়া নাহক্ অং-বং পোনা পোয়ার বা।

পুরুষদের মধ্যে বিটিনিটি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। লাক্ষ্য হইতেই ভাঙ্গালংকার মহাশয় প্রকাণ্ড এক সংকত শ্লোক কাড়িয়া কতাপকের পুরোহিতকে অভিনন্দিত করেন,—বোধ হয় অভিনন্দিত করেন, কেন না তাহাকে লাগ ছিল কি ব্যাং ছিল রামলোচন কিছুই ঠাহর করিতে সমর্থ হয় নাই। শ্লোকের অবগতই হঠাৎ একটি ছোট ছেলের মাথার হাত দিয়া আঘাত করিয়া সে ঘোহাড়াটা লাফাইয়া লইয়াছে বটে, কিন্তু ভয়ে একবারে কাঁটি হইয়া আছে এবং সেই অস্ত্র রাগে ক্রমশঃ ঘরিয়া হইয়া উঠিতেছে।

“না, না, ওকি হ’ল তট্টাচার !...ওটুকু এইভাবে করতে হবে যে...”

রামলোচন কখনও দীর্ঘবে দানিয়া লইয়া সংশোধনটুকু সারিয়া লইতেছে, কখনও বলিতেছে—“উত্তর প্রকারই হয়,” কখনও বা একটু কনিয়াই প্রায় দিতেছে—“এ-প্রকারে এইটাই পদ্ধতি।”

“পদ্ধতি !”—ভাঙ্গালংকার দিবা হইয়া বলেন, সুখে মজার শান্তি ভাঙ্গিয়া

—“ভট্টাচার্য মহাশয়, স্বর্ষ বেদন গ্রহ-উপগ্রহাদি সমস্ত উদ্ভাসিত করেন, এক নববীণের শব্দিতমণ্ডলী সেইরূপ আলমুদ্রহিমাচল নাম্না বঙ্গদেশের উপর সর্ববিধ শাস্ত্রীয় নিধানের আলোকসংগাথ করেন। এতদিন যদি এখানে এই অশাস্ত্রীয় পদ্ধতিই চলে এলে থাকে তো বৈদিক আচার স্তম্ভ হয়েছে, বেদ অবমানিত হয়েছেন বলতে হবে!”—চুই চকু অমল বর্ষণ করে, নতের সাধারণ চিণে কুলার না।



‘পদ্ধতি !...’

রাইলোচনের নূব রাতা হইয়া উঠে, তাহার পর কালো হইয়া যায় যখন অকিরাক বলে, “হ্যা, হ্যা, রাইলোচন, আবারের পক্ষ তাপ্য যে জারালকায় নশাইয়ের পারের ধূলো পড়েছে, ভুলত্রান্তিলো সব শুধরে নাও ; অবশ্য এত সময় একদিনে বাবার নয়, তবু...”

জিৎ অবিরাম উঠিতে লাগিল। এক কতকতা, শুধু উত্তরোত্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছেন, আর সকলেরই আশা আজ শেষ পর্যন্ত একটোটা টিকি হেঁড়াহেঁড়ি চলিবে। আপাততঃ রামলোচনের মস্তক দ্বারা ক্রোধান্ডই হির হইয়া বাইতেছে এবং জায়ালাংকার বে পরিমাণে সাহায্য করিতে তৎপর হইতেছেন, গ্রন্থিতে সেই পরিমাণে বেশি অটু পাকাইয়া বাইতেছে মাত্র।

এইরূপ পুরোহিতদের বিরোধের মধ্য দিয়া বিবাহের বিলম্বের কাণ্ডটা আগাইয়া চলিল। রামলোচন খুব সাবধানে অগ্রগত হইতেছে; অধেঁকটা মন রহিয়াছে মস্ত পড়ানো আর আত্মরক্ষার দিকে। অধেঁকটা অপর পক্ষের হিজামেবণের দিকে—একটা কিছু ভুল হইলে হয়, এতটুকু খলন—জুমে আসলে সব তুলিয়া লইবে, তবে তাহার নাম রামলোচন ভট্টাচার্য।

সম্প্রদান আসিয়া পড়িল। রামলোচন আগের মস্তকির অনুসার-বিস্ময়ে একটা ভৈরব টংকার দিয়া আসনের উপর পা দুইটা শুটাইয়া লইয়া বলিল, “নাও, এইবার আসল কাজ; মেয়েটিকে বাইরে পরিণে এতদিন বাতুল করলে, এইবার পর করে দাও হে অবিনাশচন্দ্র।...এটা হ'ল বাপের নাড়ি কাটা—” ব্যবসায়গত এই রসিকতাটুকু করিয়া জায়ালাংকার মহাশয়ের দিকে চাহিয়া একটু শ্রিত হাস্য করিল।

কৎবেলের নস্যাধারে দুই তিনটা টোকা মারিয়া জায়ালাংকার বলিলেন, “নিজের হাতে নিজের নাড়ি কাটা”—বলিয়া আর কাহারও অপেক্ষা না রাখিয়াই নিজের রসিকতার প্রবল অটুহাস্ত করিয়া উঠিলেন।

“অতি সমীচীন কথা, অতি সমীচীন কথা। পণ্ডিতের যোগ্যই কথা।”—বলিয়া রামলোচনও হাসিতে লাগিল; চোঁড়াগ্রন্থত বলিয়া হাসিটার জোরও হইল বেশি এবং অনেকক্ষণ হারীও হইয়া রহিল।

কৎবেলটা আগাইয়া জায়ালাংকার বলিলেন, “আজ্ঞা, লম্বা...”

গ্রহণ করিয়া বা হাতে চালিতে চালিতে রামলোচন বলিল, “নাঃ, কাশীর নিশ্চরই; মেয়েই চেনা গেছে।...অমন লম্বা আর ভু-ভারতে...”

“নাঃ, এ খোদ নববীপের। আমার ও আপনায় কাশীটাকীর লজ ডেমন...”

“নাঃ, বাঁধলো না, ভাব করে ফেললে”—বলিয়া কতকগুলো হোকবা নিরূপ হইয়া বাহিরে চলিয়া বাইতেছিল; রামলোচন বলিল, “বল নয়, তবে কাশী-

নববীপে প্রবেশ আছে বৈকি—কথায় বলে বারাগসীধায়, শিবের ত্রিশূলের উপর বার স্থিতি...”

স্মালাংকার একেবারে গর্জিয়া উঠিলেন, “নববীপের মঁহিমা অর্বাচীনে কি জানবে?”

“কাশীর নিন্দা এক বুর্খের মুখেই শোভা পায়!—রামলোচন গলার চাদরটা কোমরে জড়াইবার উপক্রম করিয়া ঠেলিয়া উঠিল।

“লেগে গেছে!”—বলিয়া ছোকরার দল লানন্দে ফিরিয়া আসিতেছিল, বয়স্ক লোকেরা মিলিয়া হুঁজুনকে থামাইয়া দিল। ছোকরারা একটু চেষ্টা করিল; হুঁজুন একটু পাশে গিয়া গলা চড়াইয়া বলিল, “হ্যাঃ, ভারি তো কাশী, একটা ত্রিশূলের ডগায় টিম্‌টিম্‌ করছে...”

হুঁজুন উত্তর দিল, “যা-যা, রেখে দে তোর নববীপ...”

ধমক-ধামক দিয়া তাহাদেরও সরাইয়া দেওয়া হইল।

রামলোচন কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, “নাও, মালাটা হুঁজুনের হাতে একটু ভালো করে জড়িয়ে দাও...নববীপের নিকুচি করেছে...বলো—সবজ্ঞ—স্মালাংকারাং—প্রজাপতিদেবতাকা!—মর্চিভ—মেনাং কজাং—স্বামহং সম্প্রদাদে...ত্রিপত্রী আর তিলওড়ু জল হাতের ওপর ছিটিয়ে দাও...নিন্, আপনি বরকে বলান এবার...”

“মন্ত্র অগুড।”—বলিয়া স্মালাংকার হাত-পা আসনের উপর শুটাইয়া লইয়া গভীরভাবে বসিয়া রহিলেন।

“অগুড!”—রামলোচনের বাঁ হাতের নস্তের টিপটা আঙুলে আঙুলে ঘূঁসিতে রূপান্তরিত হইল।

“অগুড—‘স্বামহং’ নয়, ওটা ‘তুতামহং’ হবে;—তব্বে বিভক্তি বোঝাৎ। ‘সম্প্রদাদে চতুর্থী’—একটা হুঁজুপোষা শিশুও এ-মন্ত্রটা অবগত। নববীপের বর ও-মন্ত্র অগ্রাহ্য করলে; ও ওর বোঝাভীত, বায়গাভীত।”

সমস্ত সভা একেবারে শুষ্কিত হইয়া রহিল। হুঁজুন ছোকরা বাহিরে বোড়াইয়া গেল,—তাহারই যা’ একটু শব্দ। রামলোচনের হুঁটা হাতই মুঠিত হইয়া গিয়াছিল, একটা কিছু করে করে, ঠিক এমন সময় তাহার মুঠা হঠাৎ উজ্জল হইয়া উঠিল, মুঠা হুঁটাও শিখিল হইয়া গেল। “শাই, শব্দ করে জিজ্ঞাসা করিল, “কত বোঝাৎ? সম্প্রদাদে সবার কি করতে হবে বললেন?”

সংস্কৃতের বহর দেখিয়া জ্ঞানালংকার আর সংস্কৃতে উদ্ভর মিলেন না, বলিলেন, “কিন্তু বিভক্তির অভাবে অমার্জনীয় ভ্রম হয়েছে—দ্বিতীয়া হয় না”—চাপা কণ্ঠে একটা অক্ষুট শব্দ হইল—“মূর্খ!”

“বিভক্তির অভাবে ভ্রম! তাও আবার অমার্জনীয়!”—রামলোচন গভীর বিন্মরে অনেকক্ষণ জ্ঞানালংকারের পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল, একবার দক্ষিণ হাতটা অধঃস্থাকারে ঘুরাইয়া লইয়া বলিল, “আপনারা এখানে প্রায় পাঁচখানা গ্রামের ভদ্রলোক উপস্থিত। অর্বাচীন, মূর্খ এক সামান্য পুরোহিতের একটা নিবেদন দয়া করে শুনতে হবে। জ্ঞানালংকার বলে পরিচর দিয়ে যিনি আজ পুরুষের আগুন দখল করে বসেছেন, তিনি এ-পর্বন্ত অনেক তর্কের কথাই মাঝে মাঝে তুলে গেছেন। সে-সব শাস্ত্রীয় কথা বলে ইতর-সাধারণের বোধগম্য নয়, তাই সে-সব কথা আর তুললাম না, এমন কি ঠাৱা আমাদের অভ্যাগত বলে ছ’একটা ছোটখাট কথ্য ভদ্রতার খাতিরে যে মেনেও নিচ্ছে তা আপনারা প্রত্যক্ষ করে।” এতক্ষণ আমি জ্ঞানালংকার মশাইয়ের বিজ্ঞের এমন একটা নমুনা খুঁজছিলাম যাতে আপনাদের সকলেই এক কথার তাঁর পরিচর পেয়ে যেতে পারেন তা এতক্ষণে পেয়েছি।...জ্ঞানালংকার বলছেন—মস্ত্র বিভক্তির অভাবে ভ্রম হয়েছে। কথাটা খুব ভালো করে শুুন আপনারা,—বিভক্তির অভাবে ভ্রম। আচ্ছা, এইবার আমি জিজ্ঞাসা করি...না, এখানে সবই বেটোছেলে—অর-বিশুর সবাই শিক্ষিত; বাড়ির মধ্যে থেকে কোন একজন প্রাচীনা কে ডেকে দিতে হবে।—অবিনাশের মা-ই আহুন, তাঁর চেয়ে আর প্রাচীনা কে আছে?...যাও হে অন্নচরণ, আমার নাম করে যেটাইমাকে ডেকে নিয়ে এসো—বলবে একটা সমস্তা পূরণ তাঁকে করে দিতে হবে; নববীণের জ্ঞানালংকার মশাই জ্ঞান-অজ্ঞার এক মহা সমস্তা তুলেছেন।”

চাপে চাপে ভিড়; কিন্তু একটুও চুঁ-শব্দ নাই। জ্ঞানালংকারও একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া বিস্ময়ভরিতনেত্রে চাহিয়া আছেন। একটু পরেই অন্নচরণের পিছনে পিছনে একজন প্রায় অশীতিপর বৃদ্ধা আসিয়া এক পাশাপাশি দাঁড়াইলেন। পরণে ধান কাপড়, কপাল পর্বন্ত ঘোষটা; কিন্তু প্রায় সকলের চেয়েই বড় বলিয়া ওরই মধ্যে বেশ সজ্জিত। তিনিই প্রথমে কথা কহিলেন, “বলি, ইয়াপা রামলোচন, বিরে দিতে এসে এসব কি বিদ্রি?—কথা কাটাকটি চলবে তখনই? একটা অমরল না ঘটিয়ে...”

রামলোচন নিতান্ত মিনতির স্বরে বলিল, “আমি তো, জেঠাইমা, কোন কথাই তুলি নি; মুখ্যমুখ্য গোঁয়ো পণ্ডিত, যেমন ওবনেশের বিয়ে দিয়েছি, অন্নদার দিয়েছি, তেমনি জ্ঞান নিয়ে তাদের ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিচ্ছি। তবে এই জ্ঞানালংকার মশাই মহা এক সবল্যা তুলেছেন—সেটা বীমাংসা না করলে আমি আর এগুতে পারছি না—গেরস্তর মজল-অবজলের কথা কিনা।”

ভীতকণ্ঠে উত্তর হইল, “ওমা, কি সন্মেনশে কথা। তা আমি মেয়েমানুষ তা’র কি নিশ্চিন্তি করবো বাছা; এত সব জানিয়ে-বলিয়ে পুরুষ মানুষ সরেছেন...”

“আছেন; তবে কথাটা এতই সাধারণ যে একজন মেয়েমানুষও বলে দিতে পারে, অন্ততঃ আমাদের কোটালপুরের মেয়েতে পারে, আমি এইটাই জানাবার জন্তে তোমার একটু কষ্ট দিলাম, জেঠাইমা; গ্রামটার মুখ্যদের আড্ডা শুলে একটা বদনাম আছে কিনা।” জ্ঞানালংকারের পানে একটা কটাক হানিল; মুখের শঙ্কাফুল ভাব দেখিয়া বোকা গেল—তিনি অর্ধেক কারু হইয়া আসিয়াছেন।

রামলোচন বুঝল এবার তাহার পালা, আর টেকার কাহার সাধ্য। একটা ছাড়া দিয়া সিধা হইয়া বলিয়া বলিল, “খুব একটা চলতি মেয়েলী কথা নিয়ে আরম্ভ করছি, আমাদের মুখ্য গ্রাম, সবাই বুঝতে পারা চাইতো?... জেঠাইমা, তোমরা দুটো বেয়েলী কথা ব্যবহার করো—একটা ‘ছিরি’, আর একটা ‘বি-ছিরি’।—বললে, ‘আহা, জ্ঞানালংকার মশাইয়ের বৈশ ছিরি আছে বাবু; কিন্তু, এই টেকো যেনো পণ্ডিতটা কি বিছিরি রে।’—তা’ এখানে ছিরি বলতেই বা তুমি কি সাব্যস্ত করতে চাইলে, আর বিছিরি বলতেই বা কি সাব্যস্ত করতে চাইলে?”

জ্ঞানালংকার সহজ ভাব বজায় রাখিবার চেষ্টার নিবেদন করতলের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। বৃদ্ধা ভাড়াভাড়ি বলিলেন, “বালাই, এমন ছিরি জোবার, সভা-আলো-করা চেহারা; তুমি বিছিরি হতে বাবে কেন, বাট্!...”

“ই্যা, মারের চোখে সব ছেলেই সভা-আলো-করা। বাক, আমি ককর্ণ।... তাহ’লে ‘ছিরি’ কথাটার আগে ‘বি’ এই উপসর্গ লাগালে ‘ছিরি’র অর্থাৎ এই অর্থ হ’ল তো জেঠাইমা? আমাদের পাণিনিও বলেন ‘বিত্ত অর্থসাং’— কিনা ‘বি’ অর্থ হ’ল হতিন্ত করে...”

“কি জালা! তা’ তো করবেই; ছেরকালটা করে আসছে।” ‘বি

কথাটা কি ভাল গা ? সংসারকে বলে 'বিষাতা'—ভিন্ দেখে গিয়ে লোকে কষ্ট পায়,—বলে 'বিভূ'ই।

“হয়েছে, হয়েছে ; কোন টোলের সিংগলও এরকম করে, চোখে আঙুল দিয়ে বোঝাতে পারবে না। এখন আসল কথায় আসা যাক,—ভক্তি তো হ'ল ভক্তি ; বি-ভক্তি তা হ'লে কি হ'ল জেঠাইমা ? তুমি আত্মকাল নব্বীপে মন্ত্রের মধ্যে বিভক্তি এনে কেলছেন সব—বোধ হয় বাপ-ঠাকুরদার আমলের পুরণো জিনিস বলে অশ্রদ্ধা হয়ে আসছে...”

“ছি ছি, বিয়ে দিতে বসে অনুক্ষেণে কথাগুলো মুখে এনো না, রামলোচন তোমাদের হ'ল কি ? কোথায় ভক্তি করে মন্ত্র পড়াকে, না...”

রামলোচন হাত দুইটা চিং করিয়া বিমূঢ় ন্যারালংকারের দিকে দেখাইয়া বলিল, “ওই ঠুঁকে বলো জেঠাইমা ; আমি মুখ্য, আমি অর্বাচীন, আমি তো ভক্তিই মণ্ডল ; সেইটুকু বজায় রেখে যেমন মন্ত্র পড়াতে হয় পুণ্ড্র বাচ্ছিল্যম ; ইয়া, স্বীকার করি তা'তে একটু বিলম্ব হয়ে বাচ্ছিল্য, তা ক্রমবিকাশ ‘বিভক্তি-বিভক্তি-বিভক্তি—অত ভক্তিটুকু আমাদের নব্বীপের আত্মকালকার বর বোঝে না, ধারণাই করতে পারে না’...আমি বলি—এ কিরে বাপ !... এই এতগুলো লোক তুমি, আমি কিছু বানিয়ে বলছি না। আর কেউ বুঝুক না বুঝুক, প্রসন্ন কবিরাজ তো বুঝেছে ?”

না বুঝিয়া উপায়ই ছিল না,—প্রসন্ন কবিরাজ বিজয়ের মতো মাথ হুলাইতে লাগিল ; বয়ঃ, নেহাৎ সে অল্প বুকে নাই, তাহার প্রমাণস্বরূপ একটু হুস্তিরও অবতারণা করিল, “হুস্তনার মধ্যে সম্ভ্রম, তা'তে বিভীষ না হয়ে চতুর্থা হর কোথা থেকে ন্যারালংকার মশাই ?...ঐ তো নয় !...”

রামলোচন ন্যারালংকারের দিকে দৃকপাত না করিয়া একবার সবলের দিকে চোখ বুলাইয়া প্রশ্ন করিল, “নিম্, এইবার বুঝলেন তো, সে বিজয়ের স্বাক, না শুধু লঙ্কারই স্বাক। আপন দেখলার একটু রাশ চিলে দিয়ে—কল, আমার সিন্দূকের উইয়ের পেটে যা বিত্তে আছে...হুঁ !”

সঙ্গে সঙ্গে ন্যারালংকারের পানে একটি বক হুঁ হানিয়া বলিল, “নিম্ মশাই, বরকে বিভক্তি-অভক্তি বা পড়াবেন পড়ান, এদিকে আমাদের ভক্তিই পদ্ধতি—নব্বীপের নবপদ্ধতি চালাতে দিতে পেরে না মশাই। তুমি তো

সবকালের একটা জরুরো উঠিল। ন্যারালংকার মহাশয় হাতে হাতে

টিপ লইয়া নির্বাক বিশ্ময়ে কিংভূতকিমাকার হইয়া বসিয়া রহিলেন। চারি দিকের কলরোলের মধ্যে এক তিনিই চাপা সুর শুনিতে পাইলেন, “হ্যাঃ, এই হাটে বিভক্তি দেখাতে এসেছেন—দ্বিতীয়া নয় চতুর্থী!—তোরা চতুর্থীর নিকৃতি করেছে।...”

[বক্সী, বাব ১৩৪০]

দাহর সম্রা

প্রজাপতি-সংহিতার আধুনিকতম সংস্করণে লেখা হইয়াছে,—প্রয়োজন হুঝিলে যেহে অসাবধান হইয়া হাতের রুমালটি ফেলিয়া দিবে; ছেলে সেটি ফিরিধানে তুলিয়া ধরিয়া দাগ-গোরবের অভিনয় করিয়া বলিবে—“আপনার রুমালটা...”

যেহে সেটি গ্রহণ করিয়া বলিবে—“থ্যাংকস্”, অর্থাৎ ধন্যবাদ। ছেলে প্রবল কুষ্ঠার সহিত বলিবে, “নীড্ নট্ মেনশন্স্, অর্থাৎ উল্লেখ করে লজ্জা দেখেন নুহুং”।

ইহার পর দু-জনে না-চাহিবার চেষ্টা করিয়া পরে একবার সলজ্জভাবে চাহিয়া ফেলিবে।

অতঃপর সংহিতাকার নিজেই কক্ষক্ষেত্রে নামিয়া পড়িয়া স্বপ্ন-কাল-পাত্র হিসাবে ব্যবহৃত করিবেন।

বিশ্বলেন্স কলিকাতার একটি কলেজে তৃতীয় বাৎসরিক শ্রেণীর ছাত্র। একদিন কলেজের প্রাঙ্গণে ঐ শ্রেণীর নবাগতা ছাত্রী অর্চনা রায়ের রুমালটি, ফুড়াইয়া দিবার তাহার একটু স্বেযোগ ঘটিয়া গেল। বিশ্বলেন্স ছেড়ই, অমন ছিরি কুঁকিল ছুঁবোঁগের মতো হুত্বাগও কখনও একলা আসে না। কেমন, বাই!...”

রহিল এবং এক সপ্তাহের মধ্যে আরও তিনটি অনুরূপ স্বেযোগ আসি কক্ষপূর্ণ। তাহার পুরুষকারের বলে ঘটিয়া গেল। চতুর্থ দিবসে শাস্তিনির্দিষ্ট ছিরি’র অভাব পরও সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে কিছু অভিজিত আলাপ্ত অভ্যাস—

বিশ্বলেন্স প্রশ্ন করিল, “আপনার কোন্ ইয়ার?”

আলা কুঁকিল লইয়া এককম অজ মাঝিতে গেলে যথেষ্ট আসছে। কুঁকি’

শুট হইয়া উঠে। অর্চনা সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিতে পারিল না, একটু লজ্জিত হইয়া মুখটি ঘুরাইয়া লইল। তখন বিমলেন্দুও সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া কহিল, “ও, ঠিক তো! আপনাকে আমাদের খার্ড ইয়ারেই কোন কোন ক্লাসে যেন দু-একবার দেখেছি বলে মনে হচ্ছে...”

কথাটাকে একটু টানিয়া সত্য রূপ দেওয়া যায়। যতক্ষণ ক্লাস চলে প্রতি মিনিটে বিমলেন্দু অর্চনাকে দু-একবার দেখে। ব্যাপারটা অর্চনার এমন কিছু অবিস্মৃতও নয়, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই মিথ্যার প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা, সামান্য অবিশ্বাসের ভাবও দেখাইল না।

বিমল দু’টা সিঁড়ি উঠিয়া আবার প্রশ্ন করিল, “আপনার যোলু নাম্বার ?” অর্চনা উত্তর করিল, “সাতাশী”। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নও করিল, “আপনার ?”

বিমলেন্দুর দুই আঙুলে-খরা নোটবুকটা সিঁড়িতে পড়িয়া গেল, সেটা কুড়াইয়া লইয়া বলিল, “অষ্টাশী।”

অর্চনা শুধু একটু জরাজীর্ণ করিয়া বলিল, “ও!”—তাহার এ অসামান্য কথাটি যেন মোটেই জানা ছিল না।

মিথ্যাকে আমরা প্রবন্ধ-বক্তৃতাতে যতই লাজনা করি না কেন, এ-সব ক্ষেত্রে কার্য অগ্রসর করিয়া দিতে অমন বস্ত্র আর নাই। দিব্য একটি নির্বির প্রচ্ছন্নতার আড়াল দিয়া যেন দর্পণে উভয়ে উভয়ের মনটি দেখিয়া লইল।

তাহার পরদিন বিমলেন্দুর বৈধব্য ও অস্বস্তিয়ারের অন্ত আবার দু-জনের হঠাৎ সিঁড়ির গোড়ায় দেখা হইয়া গেল। বিমল নমস্কার করিয়া বলিল, “আজ দেখছি যে আপনারও বড্ড লেট হয়ে গেল, আমি তাবলান বুঝি আমার একারই দেরি হ’ল।”

অর্চনা তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে হাতখড়িটার দিকে চাহিয়া বলিল, “হ্যাঁ, দেখুন না; একটা বাড়োয়ারী ব্যারেন্স প্রোসেসনের সঙ্গে কাঁক, না শুধু কা পড়ে গেল। আর আধ বণ্টা ধরে নিরুপায়ভাবে টাফিয়ে আমার সিন্দুকে কি বিড়ম্বনা...”

সঙ্গে সঙ্গে, “সে আর বলতে ?...আমরা দু’জন খানিকটা দেরি হয়ে যেন। দুই মিনিট দেরি, প্রোসেসার শুধু নির্ভর প্রোজেক্ট করবেন না; বাবো ভিক্টরি পড়া এমন সময় আপনাকে দেখে কঁতকটা করসা হ’ল।”

তখনলেন ভোঁটিতে উঠিতেই একটু সঙ্গত হাসির সহিত জিজ্ঞাসাবাদে সর্বজনীন মেন্দু একটু হাসিয়া বলিল, “বানে, তিনি লেডি-স্ট্রায়েজের

অসম্মান করতে পারবেন না তো?...তার পরই আমার ঘোল-মাধার—
প্রোজেক্ট না করে উপার থাকবে না।”

অর্চনা এই ফন্নির অল্প মুখ খুঁচাইয়া হাসিতে গিয়া একটু তুলিয়া উঠিল।
আরও দুইটা সিঁড়ি উঠিয়া সে-দাঁড়া মুখটা গম্ভীর করিয়া ধমকিয়া দাঁড়াইল।
বিমল মুখ তুলিয়া চাহিতে বলিল, “তীর দম্ভার খুঁবিধে নেওয়া হইবে, তার চেয়ে
একটা পাল্পেটেজ্ হারানো ভালো। এ-পিরিয়ডটা কমন্-কমে গিয়ে বলতে
বাচ্ছি। আপনি তো ক্লাসে গিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখবেন,—আপনাদের
কলারদের তো অ্যাট্টেণ্ডেন্স্ নিয়ে কড়াকড়ি অনেক...”

বিমলেম্ সে কথা উত্তর না দিয়া, অর্চনার চেয়েও মুখটা গম্ভীর করিয়া
অতি-বড় ধার্মিকের মতো বলিল, “ঠিক বলেছেন,—তীর প্রিন্সিপল্‌টা আমা-
দের ভাঙা-চুটিত হাখে না। না; আমিও তা’হলে কমন্-কমেই গিয়ে বসি।”

এইরূপ প্রোফেসার গুপ্তের প্রতি অস্ত্রায় করিয়া ফেলিবার ভয়ে দুইজন
নারীরা কমন্-কমে গিয়া বসিল।

অবশ্য কমন্-কমে বিশেষ কিছু কথাবার্তা হইল না। কারণ উভয়েই
প্রোফেসার গুপ্ত সেই পিরিয়ডে বাহা পড়াইতেছেন সেইটি খুলিয়া বসিল।
বিমলেম্ দশ-বারো বার খুব সতর্পণে দৃষ্টি ঝাঁকাইয়া দেখিল, অর্চনা প্রচণ্ড
মনোযোগের সহিত পাঠে নিরত। অর্চনাও পাঁচ ছয়বার চকিতের অল্প
বই হইতে চকু তুলিয়া দেখিল, বিমলেম্ বইয়ের সঙ্গে প্রায় মিশিয়া গিয়াছে,
বাহ-জ্ঞানশূন্য বলিলেও চলে। কেউ কাহারও ব্যাঘাত করিবে না। সত্যই
তো, তাহার প্রোফেসার গুপ্ত-সাহেবের প্রিন্সিপল্‌ ভাবিবে না বলিয়া না-
হয় ক্লাসে বার নাটু, সত্যি বলিয়া পড়ার ঝাঁকি দেওয়া তো তাদের
উদ্দেশ্য নয়।

তদু পিরিয়ড শেষ হইলে উঠিয়া দাঁড়াইতে বিমলের একটা দীর্ঘশ্বাস
পড়িল। বের কত যুগের অল্পই না বিদ্যার লইতেছে এইভাবে একটি নমস্কার
করিয়া ব্যথিত কর্তে বলিল, “আজ্ঞা, তা হ’লে আসি, মিস্ হার্ট। আপনার
কো’রুটি এ-পিরিয়ডে?”

অর্চনা বলিল, “হ্যাঁ, এর পরের পিরিয়ডে আমার হিষ্ট্রি।”

টেরিলের উপর বই-খাতার ভাড়াটা হুকিতে হুকিতে বিমল বলিল,
“আমার এ-পিরিয়ডে ফিলসফি।...আমি ছেড়ে দোষ; ছেড়ে দিবে
হিষ্ট্রিই নোব।”

হঠাৎ কিলসফির উপর এত বিরাগ কেন, আর হিষ্টির উপরই বা এত চান কিলের সে সবকিছু বলিল না।

অর্চনাও অবশ্য জিজ্ঞাসা করিল না।

সপ্তাহখানেক পরের কথা।

বিমলেন্দু ও অর্চনা একটি বেঞ্চের হই প্রান্তে বসিয়া আছে; বাঁকখানে হইজনের বই।

কলেজের বেঞ্ নর।...বেঞ্চের সামনেই একটু দূরে একটি কৃত্রিম হ্রদের কিনারা গোল হইয়া ঘুরিয়া গিয়াছে। মাথার উপরে একটি হলধে কুলের মাঝারি-গোছের গাছ, তাহার খন ছায়াটা জলের গায়ে তুলি বুলাইতেছে। কিনারা হইতে হাত-ছুরেক পরেই ঐতিকতক রাঙা কল্লারের গুচ্ছ, হইটি ছুটিয়া পরস্পরের পাশাপাশিতে জড়াজড়ি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

ওপারের বেঞ্ একটি পশ্চিমা, বোধ হয় মালী, দিগন্তে দ্যায়রা এইমাত্র উঠিয়া বসিল।

আজ কলেজে কি একটা কারণে ছুটি হইয়া গেছে, ইহারা হইজনে বাড়ি ফেরে নাই এখনও।

বিমলেন্দু বলিল, “তোমার মধ্যে আমার বা সবচেয়ে ভালো লাগে অর্চনা, তা তোমার এই বিরোধ। তোমার বুকে দিই নি—মেয়ে-কলেজ ছেড়ে তুমি বেদিন আমাদের কলেজের ফটক পেরিয়েছ সেইদিন আমি তোমার আমার মনের মধ্যেও প্রহ্লাব অভ্যর্থনা করে নিয়েছি।”

অল্প রকম কথা হইতেছিল।—প্রোফেসরদের পড়ানো—শেলী, কীটস, হইটম্যান, রবীন্দ্রনাথ—আই-এর চেয়ে বি-এ-তে বিমলেন্দুর আরও ভালো করিবার সম্ভাবনা...এর মধ্যে একটু বিরতি দিয়া হঠাৎ বীররসের অবতারণা অর্চনা একটু যেন লজ্জিত হইয়া পড়িল।

বিমলেন্দুর ভাবের ঘোর লাগিয়াছে, একটু থামিয়া বলিল, “আজ কথা হচ্ছে, তোমার এ-অ্যাটিটিউডটুকু আমার জীবন-বদলের সঙ্গে মিলে গেছে।—বা কিছু গুরোণো যুগলীর্ণ—ব্যক্তিগত ক্রটিতে, সামাজিক আচারে বা ধর্মের ছন্দানাবে—সে-সবকিছু বিরুদ্ধেই আমার অভিযান, আমি সে-সবকিছুই বা দেব। এ-অভিযানের পথে বারি আমার সঙ্গী, আমার কর্মরত, তাদের ওপর যে আমার কত প্রীতি, তা প্রকাশ করে বলবার জায় নেই, অর্চনা।”

শেষ পর্যন্ত অর্চনাকেও কথাগুলো স্পর্শ না করিয়া পারিল না ; যেয়ে হইলেও, এই যুগের যেয়ে তো—এই যুগের অগ্রণী যেয়ে ? বলিল, “আমি বিজ্রোহের কথা বলতে পারি না বিমলবাবু, তবে মেয়েদের জন্তে আলাদা ব্যবস্থাতে আমার মন সার দিলে না ; কলেজের মধ্যেও যেন মোগল-হারেমের বন্ধ হাওয়ার গুমটে আমি হাঁপিরে উঠলাম ; আমার জীবন-দেবতা আমার এই পথ দেখিয়ে দিলেন, আমি পা বাড়াতে বিধা করলাম না । আমি বিজ্রোহী কিনা জানি না, তবে আমি বে বিধা-সংকোচ ঠেলে আপনাদের সঙ্গে এসে দাঁড়লাম, এটা করলাম আমি চিরদিনের বঞ্চিত, সমগ্র নারীর অভিযোগ হিলেবেই...”

বলিতে বলিতে মুখটা তাহার দীপ্ত হইয়া উঠিল ।

এ-ভাবটা কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হইল না—হইবার কি কথা ? ফাস্তনের হাওয়ার মধ্যে মাঝে মাঝে যেমন একটা চৈতন্য হুঁকা বহিয়া যায়—এও সেই রকম !

একটু পরে আবার অর্চনার দৃষ্টি নরম হইয়া আসিল । একটু যেন অভিমানের জ্বরে অহুযোগ করিল, “আপনারা আমাদের কতই না বঞ্চিত করেছেন দেখুন তো !—এই চমৎকার নীল আকাশ, যুক্ত হাওয়া, জলস্থলের এই কতরকম সৌন্দর্য, চারিদিকের কত বিচিত্র জীবন...পুরুষের বিরুদ্ধে আমাদের নালিশ...”

বিমলেন্দু হঠাৎ বাধা দিয়া প্রতি-অহুযোগের স্বরে বলিল, “আমি বঞ্চিত করেছি, অর্চনা ?”

অর্চনা একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল ; বলিল, “না, আপনার কথা বলছি ; আপনি তো আমার এর সন্ধান দিয়ে নিয়েই এলেন ; আমি বলছি গারব-স্বীকৃতি আর পুরুষের কথা । তাবুন তো আমাদের মেয়েরা কতটা পণ্ডিত থাকে !”

বিমল বলিল, “তারা ইচ্ছে করেও থাকেন অনেকটা ।”

“কেন ?”

“যদি তুমি তো যোজ একবার করে আগতে পারো ; কই, আগরে ?”

অর্চনা একটু হাসিয়া বলিল, “কলেজ-কাবাই হবে বে ।”

বিমল বলিল, “আমি পারি,—যদি এরকম পরিপূর্ণ সৌন্দর্য পাই, অর্চনা ।
কলেজে যদেই আমার মনে হয় আমি এখান থেকে কাবাই করছি ।”

‘পরিপূর্ণ’ কথাটার উপর ঝোর দিল এবং গদে বসিল, “তোমরা বীধন ভালোবাসো, অর্চনা; হাজার সৌন্দর্যের জন্মেও বীধন কাটতে পারাজ।”

আর একটু পরে সামনের পুষ্পভবকের উপর নজর রাখিয়া বসিল, “বোধ হয় তোমরা নিজের মধ্যেই পরিপূর্ণ বলে মনে কর এবং তৃপ্ত থাকো।”

অর্চনা মুখ ঘুরাইয়া লইল, সেই ভাবেই প্রশ্ন করিল, “সবাই কি?”

বিমল একটু ভেদের সজ্জা করিল, “কেন, কোথায় তোমার অপূর্ণতা? বলো—কিসে?”

অর্চনা সন্তুষ্ট আর তৃপ্ত থাকার আগে প্রশ্নটা করিয়াছিল, নিজের ভ্রমটা বুঝিতে পারিয়া লজ্জার রাঙিয়া উঠিল। অনেক চেষ্টা করিয়া, বিমলের দিকে একবার মাত্র চাহিয়া বলিতে পারিল, “উঠবেন না?—আমরা গাড়ি বোঝ কলেজে এসে গেছে এককণ।”

বিমলেমু ডাকিল, “কচি।”

নূতন কাহাকেও ডাকিল না, সে আশ্চর্য অর্চনাকে এইভাবে ডাকিতেছে; এ-শ্রেণীর লোককে যদি অনুভব দেওয়া হয় তো সেটাকেও কীর করিয়া লইয়া ছাড়িবে।

সেই জলের ধারের আরগাটি। শেষের দিকের দুইটি শিরিয়ডে ছুটি ছিল, সব শেষের শিরিয়ডে প্রোফেসার বোল হঠাৎ অস্থির হইয়া পড়েন।

আজ ছয়দিন পরে; কিন্তু এই ছয় দিনে অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। অর্চনা হইয়াছে কচি। কচি প্রবল হইলে বিমলেমু কখনও ‘অকচি’ বলিয়া ডাকিয়া ফেলিতেছে। বিমল দর্শনশাস্ত্র ছাড়িয়া ইতিহাস লইয়াছে, আজ এখানে আসার ইতিহাসটুকুও এই ব্যাপারটির সহিত জড়িত। অর্চনার নিকট হইতে পুরাতন নোটগুলি টুকিয়া লইবে, তাই দুইজনে এই মিথি মিথি-টুকু আশ্রয় করিয়াছে।

অর্চনা নোটের পাতা উলটানোর মাঝে থামিয়া উত্তর করিল, “কি?”

বিমলেমু প্রত্যুত্তর কিছু দিল না। অড়মুখ করিয়া বে রাস্তা কল্যাণ হইতে ছিল তাহার আর নাই; সেই শূন্যতাটুকুর দিকে চাহিয়া রহিল।

অর্চনা নোটের পাতা আরও থানিকটা এগিক তবিক উলটাইল। তাহার

পর মৌনতার অবস্থিতি কাটাইবার অন্তই বোধ হয় প্রসন্ন করিল, “খ্রীষ্টের ছুটির আগে যে সোজাল পাট হবে তা’তে আপনি কোনও পাট নিলেন না কেন বিমলবাবু?...অত করে বললে সবাই...”

বিমল ধীরে ধীরে চক্ষু তুলিয়া প্রশ্ন করিল, “তুমিও একথা জিজ্ঞেস করে তবে জানবে, ক’টি?”

অর্চনা একটু চিন্তা করিল,—আবার নোটের পাতা উলটাইতে উলটাইতেই তাহার পর একটা পাতা আঙুল দিয়া হুড়িয়া ধরিয়া বলিল, “বুঝলাম না।”

“বিচ্ছেদটা কি একটা উৎসব, ক’টি?”

অর্চনা প্রথমটা বুঝিতে পারিল না, তাহার পর কথাটার অর্থ তাহার মনের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া তাহার মনটিকে ভাষাক্রান্ত করিয়া দিল, সে মুখ ফিরাইয়া একদিকে চাহিয়া রহিল। সত্যই তো, এই খ্রীষ্টাবকাশের দীর্ঘ-শতিনটা মাস আর বাহার কাছেই উৎসব সূচিত করুক—অন্ততঃ একলেজের দুইটি প্রাণীর কাছে যে করে না, তাহাতে কি কোন সন্দেহ আছে?...ওদের সবার সামনে প্রিয়জনের সঙ্গে মিলন—সেই মিলনকেই ওরা আমন্ত্রণ করিতেছে এই উৎসবের দ্বারা। ওরা যে নাম দিয়াছে ‘বিদায় অভিনন্দন’,—ওটা ভুল,—ওদের বিদায়ে হুঃখ নাই বলিয়াই এটা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু যে দুজনের পক্ষে এ বিদায় সত্যই বিদায়—এই অবকাশ বাহাদের মধ্যে শতাবধি দিনব্যাপী শতবৃন্দের দাহন আনিবে, তাহাদের কি উৎসবের অবসর আছে?...অর্চনার আশ্চর্য বোধ হইল যে, এদিকটা ভাবে নাই কেন এবং যে এই ভাবনারই মুহূর্ত্ত, তাহার সামনে একটু অপ্রতিভ হইল।

সেদিন দু-জনে বাহিরে-বাহিরে কথা আর বেশি কিছু হইল না, তবে দু-জনের মনের মধ্যে যে সমস্ত কথা নিঃশব্দে উঠিয়া মিলাইয়া বাইতে লাগিল সে-সব একই প্রকৃতির।

কলেজ বন্ধ হওয়ার সময় হইয়া গেল। জলের ওধারটার সবুজ বাগের উপর দু-একটি করিয়া সাহেবদের ছেলেমেয়ে আসিয়া খেলা করিতে লাগিল, তাহাদের আরা আর বয়রা বোড়ার উপর বসিয়া গল্প করিতেছে। দু-জনে উঠিল। কথার অভাব হইয়া পড়িয়াছে আজ, অথচ উঠিবার সময় যে দীর্ঘ-কালটুকু পড়িল সেটাকে চাকিতে কিছু বলিডেই হয় বেন।

অর্চনা সামনের একটি কল্লারের দিকে চাকিয়া বলিল, “আচ্ছা, কল্লার
যখন খুলবে তখনও এসব কুটেতে থাকবে?”

বিমল বলিল, “কি জানি, কচি? তিন বাস একটা হুগ বে।”

সে-রাত্রে অর্চনার নিদ্রা হইল না। কিছু সে তো আর কালিদাসের হুগের
ঘেরে নয় যে, বিরহের সূচনাতে শূঙ্কর পরিবর্তন করিয়া বীণার তার বাধিতে
বসিয়া বাইবে।

সকালে উঠিয়া ছোট ভাই প্রবীরকে ডাকিয়া বলিল, “বীক, তোমার
বইগুলো নিয়ে এসো তো; যে-রকম অনন্যোযোগী হয়ে উঠছো দিন দিন..”

প্রবীর ছেলেটি ভালো, ইংরেজী পড়া বেশ ভালোই দিল। ইতিহাস
আনিতে বলা হইল; বেশ সন্তোষজনক উত্তরই দিল। অর্চনা তাহাতে
অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল, “বুঝ করবার গুলো তো একরকম চালিয়ে দিলে, অক
নিয়ে এসো তো দেখি।”

সহজ অঙ্কে আটকাইবে না বুঝিয়া, বেশ বাছা বাছা গোটাকতক অক
দিল। তাহাতে বেশ মনের মতো ফল পাওয়া গেল। ভিতরে ভিতরে
ভাইয়ের উপর খুশি হইয়া অর্চনা একান্তে রাগতভাবে বলিল, “আমি জানি
কিনা,—দেখছি এদিকে বেশ গা ঢেলে দিচ্ছে!”

অভিভাবক ঠাকুরদাদা। নামজাদা উকিল ছিলেন। লোকে বলে বড়
পাকা মাথা। ছিল বোধ হয় এক সময়, এখন সেটি সম্পূর্ণরূপে নাতনী
হাতে সমর্পণ করিয়া নিরুদ্ভাট জীবন বাপন করিতেছেন। গঙ্গাহাম,
কালীঘাট ও ভাইটামিন আর পরমাহুতেশ্বর আলোচনার অবসরটা
বিতক্ত।

অর্চনা বলিল, “দাহু, বীকর অবস্থা দেখেছ?—অকস্মে ৩ ভাই
কেল করবে; এই সাধারণ-ভেকেনের পরেই ওদের পরীক্ষা, বাস ভিদেরক
নেই। নিজের মোটেই সময় নেই যে দেখি; কি বে হবে!...”—বড়ই
চিন্তাবিত্ত ভাবটা।

বীকর ডাক পড়িল। আসিলে ঠাকুরদাদা বলিলেন, “অকটা ঠিক ভৈরী
নেই তুমি। তুমি যোজ রাতিয়ে আবার কাছে এসে বোসো তো এরি-
মেটিকটা নিয়ে।”

অর্চনা একটু হুগ করিল, তাহার পর বলিল, “হ্যাঁ, তুমি আবার ঐ

করো। একে ভালো ঘুম হয় না রাত্তিরে; তার ওপর ওর সঙ্গে ববে বকে...আমি বলছিলাম একটা নাহয় টিউটার রেখে দাও না।”

টিউটার লব্ধে ঠাকুরদাদার চিরকালই আগ্রহি; বলেন, “ও তে বাজারের নোটের সামিল—গুধু হাত-পা আছে, চলে বেড়ায় এই ব তফাৎ।”

কাল পৰ্ব্ব অর্চনারও এই মত ছিল। গত রাত্রি হইতে বদলাইয়াছে বলিল, “বরাবর না হয়, অন্ততঃ তিন মাসের অন্ত্রে একটু সামলে দিক্, তার পর...”

ঠাকুরদাদা চিন্তিতভাবে বলিলেন, “টিউটার?...তা তুমি যখন বলছো... নিজে মেক আপ করে নিতে পারবে না বীক তুমি? সেই হ’ত ভালো—আম্বাচেটা...”

বীক উৎসাহতরে উত্তর দেওয়ার আগেই অর্চনা বলিল, “না, পারবে না।”—এমন জোরের সহিত বলিল যে বীক চূপ করিয়া রহিল।

“তা হ’লে দেখ...তোমাদের মাস্টার কেউ রাক্ষি হবেন বীক?—তিন মাসের অন্ত্রে?—জিগ্যেস করে দেখবে আজকে?”

বীক উত্তর দিবার আগেই অর্চনা আবার জোর দিয়া বলিল, “না না, হবে না রাক্ষি; স্কুলের মাস্টারদের বাধা টিউশান থাকে।”

বীক আবার চূপ করিয়া গেল। ঠাকুরদাদা বলিলেন, “রয়েছে!—তোমাদের কলেজের কোন ছেলে পাওয়া যাবে না? জিগ্যেস করে দেখো না, সামনে তিন মাসের দুটি পড়ে রয়েছে।”

“তুমি কথাগুলো একটু ভেবে বলো তো, দাছ! আমি জিগ্যেস করতে যাঁবো—আমার লেখানে কার সঙ্গে জানাশোনা?”

“ভবে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দেবে? দাঁড়াও, আমি না-হয় দেখি ছ’টার অনেক জিগ্যেস করে।”

ঠাকুরদাদার হাতে গেলেই তো বেহাত হইল। কলেজে একটা অপরিচয়ের ভাবটা দেখান ভালো হয় নাই। একটু চিন্তা করিয়া অর্চনা বলিল, “রোসো দাছ, এক কাজ করা যাবে, একটা বিজ্ঞাপনের মতো লিখে পিওনকে দিয়ে আমাদের কলেজের নোটিশ-বোর্ডে টাঙিয়ে দেব’খন। যারা চারি তোমার সঙ্গে দেখা করুক, তুমি বেছে নিও।”

“তুমিও থাকবে তো।”

“না, আমার দ্বারা হবে না।”

“থাকলে ভালো হ'ত। লোক বাছা একটু শক্ত কিনা।”

লোক বাছা একটুও শক্ত হইল না, কারণ অত বড় কলেজের মধ্য হইতে একটিমাত্র ছেলে আসিয়া ঠাকুরদাদার সহিত দেখা করিল। তিনি ইন্সি-চেরারে হেলান দিয়া কাগজ পড়িতেছিলেন। ছেলেটি বারান্দার উঠিয়া একটা নমস্কার করিয়া বলিল, “এই কি উমেশবাবুর বাড়ি? তাঁর সঙ্গে—মানে, তিনি...”

“...আমিই উমেশবাবু, কি দরকার আপনার?”

“আমাদের কলেজের নোটিস্-বোর্ডে একটা এ্যাড্‌ভার্টাইজমেন্ট...”

ঠাকুরদাদা উঠিয়া বলিলেন, বলিলেন, “ও, ই্যা ই্যা, ঠিক, আমার চাই একটা টিউটার। কোন্‌ ইয়ারে পড়েন আপনি?”

ছেলেটি একটি চোক গিলিয়া বলিল, “থার্ড ইয়ারে।”

বেশ ছেলেটি।—দীর্ঘ, সবল চেহারা; ছিমছাম পরিচ্ছদ; মুখে বেশ একটা বুদ্ধির ছাতি। একটা আবেদন লইয়া আসিয়াছে; কিন্তু কোথাও একটু হীনতার ভাব নাই, হৃদ একটু সলজ্জ বলিতে পারা যায়।

বৃদ্ধের ভালো লাগিল, বলিলেন, “বহুন, বহুন ঐ চেয়ারটার। থার্ড ইয়ারে পড়েন? তাহ'লে ভো আমাদের অর্চনার সঙ্গে আলাপ আছে নিশ্চয়।”

ছেলেটি অজের মতো একটু ক্র কুক্ষিত করিল যাত্র, যেন মনে করিবার চেষ্টা করিতেছে।

বৃদ্ধের পাকা ক্রও একটু বেন কুক্ষিত হইয়া উঠিল, “ভেনেন না? ক'টি কিমেল স্টুডেন্ট থার্ড ইয়ারে?”

ছেলেটি ক্র হুইটি একটু তুলিয়া বলিল, “ও, মিস্‌ দারের কথা বলছেন? তিনি কি এই বাড়িতেই...”

বৃদ্ধের ক্র কুক্ষন এবার মিলাইয়া গেল, “আমার নাভনী কিনা। এই জে ছিল একটু আগে।...অহু!”

ঐকীর আসিয়া বলিল, “দ্বিদি এইমাত্র গাড়িতে করে বেরিয়ে গেল।”

“কোথায় গেল হঠাৎ?—বাকি, আলাপ হবেই। ই্যা, কলেজে আর আলাপ হবে কি করে?—অত দূর তো পাওয়া যায় না।...এই ছেলেটি

আপনার ছাত্র। তোমার মাস্টারমশাই বীক, এগাম করো।...কি না আপনার।”

“বিমলেন্দু দত্ত।”

“বার্ড ইয়ার—বি-এস্‌সি।”

“আজ্ঞে না, আর্ট্‌স।”

“কি কি সাব্‌জেক্ট নিয়েছেন ?...আর সাব্‌জেক্টের জন্তে তো ভারি বাধা—ছাত্র আপনার মোটে ফিক্‌শ্‌ ক্লাসে তো পড়ে।”

“ম্যাথ্‌মেটিক্‌স্‌ আর হিস্ট্রি।”

“অচূঁরও তো ঐ কবিনেশান্‌!”

বিমলেন্দু চোখ তুলিয়া সামনের গাছটার ডগায় অভ্যস্ত মনোযোগে সহিত কি একটা দেখিতে লাগিল।

দেখিবার এমনই চমৎকার ভঙ্গি যে এবার ঠাকুরদার জু আর একটুও কুণ্ঠিত হইতে পারিল না, এমনই মনে মনে হাসিয়া নিজের মনেই বলিলেন, “দেখ, এ-যুগ আর সে যুগ!—শ্রামবাজারে মেয়ে-স্কুল খুললো—মাইল খানেক পথ ঘুরে কলেজে গেছি—একটু পাশ দিবে বাবার লোভে।...আর এরা এক ক্লাসে পড়ে—এক কবিনেশান্‌—নাম পর্যন্ত জানে না!—ভালোই!”

এ-যুগের এ-বেচারীরা একটু লাজুক বেশি। মেয়েরা যতই বাহির হইয়া আসিতেছে, ইহারা ততই যেন সংকুচিত হইয়া অন্তর্মুখী হইয়া পড়িতেছে। অথচ শরীরের চর্চাও করে সব পূর্বের চেয়ে বেশি; পুরুবাগলি ভাব আছে, ইকি ইকি করিয়া লম্বা বকের ছাতি বাড়ার—চওড়া ছাতি চিতাইয়া পাড়ায়। এই ছেলেটি ওদেরই টাইপ। বেশ ভালো লাগিতেছে বিমলেন্দুকে। নূতন পরিচয় হিসাবে কথাবার্তা একটু বেশিই হইল বরং,—টিউশানের পরিধির বাহিরেও গড়াইয়া গেল।

“অনাস্‌ নেওরা হয়েছে ?...অচূঁ নিলেনা, মেয়েছেলের অতটা দরকারও নেই।”

“আজ্ঞে হ্যাঁ, ম্যাথ্‌মেটিক্‌স্‌।”

“হঁ, ম্যাথ্‌মেটিক্‌স্‌। আর অনাস্‌!—ছাই এডুকেশানের বা অবস্থা! পড়ে লোকে করবে কি ?...আপনার উদ্দেশ্যটা কি ? ঠিক করেছেন কিছু ?”

“দেখি, কম্পিউটিভ্‌ এগ্‌জামিনেশান দেওয়ার ইচ্ছে আছে কোম-একটা।”

বিমলেন্দুর আর বাহাই দোষ থাক আশ্চর্য্যবাটা নাই। কথাটা শ্রদ্ধার

কানেই একটু গালভরা শুনাইল বলিয়া জুড়িয়া দিল, “কোন রকম ব্যাকিডের জোর নেই কিনা যে এমনি চাকরি-বাকরি কোথাও পেতে পারবো...”

বাঃ, বেশ ছেলে, ঠাকুরদাদার উত্তরোত্তর এর সাহচর্যটি বেশি করিয়া ভালো লাগিতেছিল—প্রজাপতি কি অবতীর্ণ হইলেন যুদ্ধের মধ্যে? একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইতেছিল; কিন্তু একটু কুঠাও হইতেছিল। অবশেষে একটু ঘুরাইয়া বলিলেন, “হ্যাঁ, স্টুডেন্ট কেরিয়ার ভালো হ’লে ও-দিকেই চেষ্টা করা ভালো।”

যুদ্ধের দিকে একটু লগ্ন প্রদর্শন নেড়ে চাহিলেন; কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া সোজাঅজিহে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার ম্যাট্রিক, আই-এ-তে কোনও প্লেস ছিল?”

বিমল একটু লজ্জিতভাবে বলিল, “আজ্ঞে না, প্লেস কোন ছিল না, তবে...”

একটু ধামিয়া বলিল, “ম্যাট্রিকে একটা ডিভিশনাল স্কলারশিপ পেয়েছিলাম, আই-এ-তেও পাচ্ছি একটা স্কলারশিপ, তবে ঠিক প্লেস থাকে না।”—বলিয়া মাথা একটু নিচু করিল।

“বড় আনন্দ হ’ল শুনে। অল-ইণ্ডিয়া কম্পিটিশানে যাবেন। ওদিকে আমাদের বাঙালীর ছেলেরা বেশি এগজে না; ঠিক হচ্ছে না এটা।...বীক, তোমার মাস্টারমশাইকে চা’টা এনে দাও...অল-ইণ্ডিয়াতেই দেখেন। কই, আমরা তিন-চার জেনারেশনে যে-জায়গাটা হাঁসিল করলাম বাঙালী জাতটার অস্ত্রে, আপনারা তা’ রাখতে পারছেন কই!”

বিমলেন্দু লজ্জিতভাবে বলিল, “আজ্ঞে, অপবাদটা দেওয়া আপনারদের অসংগত নয়, তবে কারণ তো একটা নয়—জানেনই তো।”

“তা হোক, তবু আপনারদের মতো ভালো ছেলেরদের এ-বিষয়ে জাতির প্রতি একটা কর্তব্য আছে। না, চেষ্টা করতে হবে; আমি আপনার রেকর্ড গুচ্ছ করতে থাকবো।”

হাসিয়া বলিলেন, “আপনি বোধ হয় ভাবছেন—আমি করতে এলাম মাস্টারি, আমার ওপর এ-আবার কোথেকে এক মাস্টার জুটে গেল যে বাবা!...কি জানেন? বলে বলে কাগজে দেশের ছুঃখ-দুঃখের কথা পড়ে বড় দ’বে যেতে হয়। বুড়ো হয়ে আর বেশি ঘোরাফুরি সত্য-সমিতি চলে না যে এ নিয়ে একটু চর্চা করবো; তাই একটা রোগ ঝাড়িয়ে দেহে—ইয়ংম্যান কাউকে কাছে পেলেই...”

বীক ডা জলখাবার লইয়া আসিল। অনেক ইকম কথা হইল; নান রকম খবর রাখে ছেলেটি, আর বাহা বলে নিতান্ত ভাসা ভাসা নর। ওই সময় ঠাকুরদাদা বলিলেন, “জা হ’লে আগনি পড়াতে আরম্ভ করে। বত শীগগির পারেন। ছাত্র আগনার অঙ্কে একটু কাঁচা, ঐদিকটা এ একটু করে হেল্প করে যাবেন। আমি আবার বেশি কোচিং পছন্দ না। হ্যাঁ, টার্মসের কথা...”



“...চেনো খোব হয় একে?”

একদা সময় বাড়ির পাড়িটা কটক পড়র হইয়া পাড়িবারাখার আসিয়া দাড়াইল। ভিতরে অর্চনা।

নে ভাবিরাহিল এতকথ বিবলেদু নিচর চলিয়া গিয়া থাকিবে। ভাহাতে

আস্তিক

ঠাকুরদাদার সহিত বারান্দার বলিরা থাকিতে দেখিয়া সংকোচে—হু' অথবা নিকটেই সংকোচে—গাড়ি হইতে নামিতে পা উঠিতেছিল না। কিন্তু তখন তাহার আর কিরিবার পথ নাই।

ঠাকুরদাদা উৎকণ্ঠভাবে বলিয়া উঠিলেন, "এই যে অর্ছ এগেছে।...নেবে এসো। ইনিই বীকর টিউশনের জন্তে এগেছেন।...কোথার খুজিলে অর্ছ তুমি?—এত সকালেও ঘেমে উঠেছ, মুখখানা রাঙা হয়ে গেছে।...চেনো বোধ হয় এঁকে? তোমাদের ক্লাসেই পড়েন...কি যে বেশ নামটি বললেন আপনার?"

নিজের নাম বলা যে অবস্থাবিশেষে এত শক্ত বিষয়ের তাহা জানা ছিল না। গলার কাছে এলোমেলো অক্ষরগুলো কোনরকমে জড়াইয়া বলিল, "বিম্—বিমলেন্—হু।"

হাতের কমান্ডটা কপালের ঘামের উপর চাপিয়া অর্চনা নিজের মতো জু কুঞ্চিত করিয়া ঝাঁড়াইল,—একটু পূর্বে বিমল নিজে যেমন ঝাঁড়াইয়াছিল—কোন মতেই মনে পড়িতেছে না নামটা।

ঠাকুরদাদার জু জোড়া এবার যেন কয়েক সেকেণ্ড বেশি কুঞ্চিত হইয়া রহিল, সেই সঙ্গে অথরের এক প্রান্তে যেন সামান্য একটু হাসিরও আভাস পাওয়া যায়।

[প্রবাসী, অক্টোবর ১৩৪৩]

আস্তিক

স্লোচন হালদায়ের বুকেও যে বাত্বের স্পর্শও মুকম্ব করিতোছিল এ সংবাদ পাইয়া গ্রামের সকলেই অভিমান বিমিত হইয়া উঠিল।

লোকটার কাছে ধর্ম নাই, সমাজ নাই, এমন কি যদি বলা যায় যে আত্মীয়-পরিজনও নাই তো নেহাৎ বিখ্যা বলা হয় না। কাকার মুকুতে তাহার ইন্সিওরেন্সের টাকাস্ফল্য কিনারা করিতেই স্লোচন হালদায় নাকি একদা বাড়িয়া গিয়াছিল যে প্রান্তটা পর্বত বাস পড়িয়া যায়। কথ্যটা শব্দপক্ষে, বোল আনাই সত্য নয়; তবে প্রান্তের পূর্বের ক'টা দিন স্লোচন গ্রামে ছিল

না ; কাজের দিন সকালবেলা কলিকাতা হইতে ফিরিয়াই অল্পসত বন্ধু এর পরামর্শদাতা নবীন দত্তকে ডাকাইয়া আনাইয়া বলিল, “নাও, ভিলকাধনে যোগাড়টুকু ত্যাগাতাড়ি করে ফেল নবীন, আমি শুটি-বারো ব্রাহ্মণ বনে আসি। মনে করেছিলাম গাঁয়ের সব ব্রাহ্মণগুলিকে ধাওয়াবো—আমার বিশ্বাস নেই ওসবে, তবুও একটা সমাজপ্রথা—তা টাকাসুলো এমন গোলমাল করে গেলেন, যদি সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে না পৌঁছোই—জোজোরদের পেটে যার পরলোক তো আছে নবীন একটা ?—তঁার কষ্টার্জিত টাকাসুলি যদি তাঁর ঘরে এসে না পৌঁছতো...”

নবীন দত্ত পূরণ করিয়া দিল, “তা হ’লে হাজার খটা করে শ্রদ্ধ করলেও কি তাঁর আত্মার শাস্তি হ’ত ?...আর লোক খাওয়াবার কথা নিয়ে ভূমি মনে খেদ রেখো না দাদা ;...হ্যাঁ গো, এমনও তো গ্রাম আছে যেখানে বামুনের পাটই নেই, সেখানে তো লোকে মরেও না, তাদের শ্রদ্ধও হয় না।”

পারিবারিক জীবনটি একটি নিত্যস্থ পুরাণো পদ্ধতি ধরিয়া বহিয়া চলিয়াছে—পূজা-পার্বনে কি অতিথি-অভ্যাগতে যে একটু বিচিহ্নতা আনিবে তাহার উপায় নাই। কাকার টাকা বের করার মতো অবস্থায় পড়িলে সুলোচন পরলোকের নাম করে মাঝে মাঝে, প্রসঙ্গ উঠিলে কথার কথা হিসাবে দেবতাদের কাহাকে-কাহাকেও আনিয়া ফেলে, কিন্তু দেবতার যখন কাল, লগ্ন প্রভৃতি ঠিক করিয়া নিজেরা আসিতে চান তখন আমল দেয় না। বলে, “তর্কবাগীশ মশাইয়ের শিষ্য—আমার কাছে ওসব ধাপ্লাবাজী খাটবে না। তা ভিন্ন বাদের নিজেরদের একটু উপায় করে নিজের নিজের পেট চালাবার ক্ষমতা নেই, কোথায় কে একটু ভোগ দেবে তার ওপর নির্ভর, তাঁরা আবার আমার উপকার করবেন !—গেছি আর কি !”

লোকটা কখনও অবশিত হয় নাই—সাধু, সন্ন্যাসী, গুণী, গণ্যকার বৈসিতে দেয় না, বলে—“আমার বিশ্বাস নেই।” হু-মুঠা ভিক্ষা দিয়া পুণ্যার্জন করিতে চায় না, বলে—“বিশ্বাস নেই।” বাড়িতে অস্থির-বিস্থির করিলে ডাক্তার-বৈজ্ঞানিক হাঁজাম করে না ; ঐ এক বুলি—“বিশ্বাস নেই।”

ছোট কথা, সুলোচন অবিবাহের বেড়া দিয়া খরচের সমস্ত ভারগুলি বহন করিয়া নিজের সঙ্গীদযান অর্থভাণ্ডারের মধ্যে জীবনের প্রায় সবটাই কাটাইয়া দিল। এখন বরষ তাহার পক্ষান্তরে কাহাকাহি।

প্রানের লোক পরোকে তাহাকে এবং তাহার বাজবন্দী টাকাকে

অভিসম্পাত করে। প্রয়োজন হইলে গোটা কতক প্রতিরোচক কথা বলিয়া চড়া মূর্খে হাওলাৎ লইয়া যার। এই ভাবে দিন যায়, এমন সময় এক দিন মুলোচনের জী-বিরোগ ঘটিল।

মুলোচনের জী মানময়ী প্রায় বৎসরাবধি নানা রকম জটিল ব্যাধিতে ভুগিতেছিলেন। প্রথমে উপসর্গগুলি সামান্য আকারে দেখা দেয়। অতঃপর তিনি এ-বাড়িতে কাহারও নজরে পড়ে না, কেহ গা করিল না। যখন জটিলতা দেখা দিল, মুলোচন বেশ ঘটা করিয়া গোরচন্দ্রিকা করিয়া জীকে বলিল, “দেখ, তোমার শরীর ভুমিই ভালো বোঝ, বলতো না হয় শহর থেকে বড় ডাক্তারকে নিয়ে আসি। আমি তো মনে করছিলাম নাইতে-খেতে সেয়ে যাবে; রোগকে যত আঁড়ারা দেওয়া যায় ততই পেয়ে বসে; কিন্তু ঐ যে বললাম—তোমার শরীর ভুমিই ভালো বোঝ, শেষে এমন না হয়...”

মাছুষ এক দিনেই চেনা যায়, মানময়ী তো এই লোকের সঙ্গে প্রায় ত্রিশ বৎসর ঘর করিতেছেন; মনের অভিমানটা চাপিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, “তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি, কি হয়েছে শুনি বে শহর থেকে লাভ তাড়াতাড়ি বড় ডাক্তার এনে ফেলতে হবে? বয়স হয়েছে, এখন তো এসব একটু-আধটু দেবেই দেখা মাঝে মাঝে...”

জীর কাছেও একটু চক্কুলজ্ঞা হয় এবং মুলোচনের মতো মাহুয়েরও চক্কুলজ্ঞা বলিয়া একটা বস্তু থাকে। পাশের গ্রামের উদীরমান হোনিওপ্যাথ নীনেমকে ডাকা হইল। সে মাস চারেক আগে আসিলে বোধ হয় কিছু ঠাहर করিতে পারিত। কোন ঠে পাইল না।...মুলোচন কৌচার খুঁটে চক্কু মুছিয়া অপ্রকৃত কণ্ঠে নবীন দস্ত এবং আরও পাঁচ-সাতজন যাহারা কাছে ছিল তাহাদের বলিল, “যেয়েদের কথায় কখনই বিশ্বাস করি নি, একবার করলাম, তার ফলও হাতে হাতে পেলাম। কত করে বললাম, ‘ওগো, গতিকটা বেশ ভালো বোধ হচ্ছে না, বাই, একবার শহর থেকে অ্যাসিস্টেন্ট সার্জেনকে ডেকে আনি।’ মাথার দিবি দিরে ডাকা-গাড়ি ফিরিয়ে দিলে—কি?—না, ‘আমার শরীর আর্মিই ভালো বুঝি, বয়সের দোষে ওরকম একটু-আধটু হয়, আবার নাইতে খেতেই সেয়ে যাবে’...এই তো সেয়ে বাড়ার!...উক!...”

বাই হোক জীর প্রাক্কিরাটা মুলোচন ভালো ভাবেই করিল এবং এই দলকবীর ব্যাপারে সকলে বিম্বিত হইল। অবশ্য দানসাগরও নয়, কুদোদর্শও

নয়, তবে গ্রামের ইতর-ভদ্র সবাইকেই এবং পাশাপাশি তিনটি গ্রামের সমগ্র ব্রাহ্মণগুলিকে বলিল। যাহারা একটু ব্যঙ্গশ্রবণ তাহারা বলাবলি করিল “পরিবার আর কাকার মধ্যে তফাৎ আছে বইকি।” অনেকে সোজাভাবে লইল ব্যাপারটা, বলিল, “যাই হোক, মাহুষের চামড়া গারে আছে বলতে হবে। জীর বেলাও যদি অষ্টরজ্জা দেখাতো তো কে কি করতে বলো?”

অভিমত যে যাহাই দিক, কি করিয়া যে ব্যাপারটা সম্ভব হইল সেটা গ্রামের সকলেরই একটা গভীর সমস্যা এবং গবেষণার বিষয় হইয়া রহিল।

জাতি-ভোজনের দিন কতকটা আভাস পাওয়া গেল।—

আহারের পর সকলে আসিয়া ঠৈঠকখানায় বসিয়াছে, পান-তামাকের সঙ্গে গল্প চলিতেছে। ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, “না, কাজটি তুমি বেশ সুচার-ভাবেই করেছ সুলোচন, ‘কাল অনাথকে’ আমি সেই কথাই বলছিলাম,—বলি, সুলোচনের প্রাণ আছে, বোমার কাজটা যেভাবে করলে...”

নবীন দস্ত ঠিক তাল বোঝে, বলিল, “তা যদি বললেন কেতু-কাকা, সুলোচনদাদার কবে কোন্ কাজটাই খেলো হয়েছে?”—সকলের মুখের উপর একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া বিজ্ঞভাবে একটু হাসিল।

এর পূর্বে যে আবার সুলোচন কবে কি কাজ করিয়াছে—কাহারও মনে পড়িল না। তবে অবস্থাটা অস্বকূল নয় বলিয়া সে কথাটার আর কেহ উচ্চ-বাচ্য করিল না।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, “তা যে হয়েছে তা তো বলছি না, মন দরাজ হ’লে কাজ ভালো না হয়ে উপায় নেই। তবে এবারকার এ কাজটা যেন আরও উৎসাহে পড়ে। বলতে পারি না আমার মনের ভ্রম কি না, তবে...”

“ভ্রম নয়, এর রহস্য আছে।...দাও, অনেকক্ষণ হয়েছে”—নবদীপ ক্ষেত্রমোহনের হাত থেকে গড়গড়ায় নলটা লইয়া দুইটা টান দিয়া বলিলেন, “ভ্রম নয়, এর রহস্য আছে। ষাঁস কাজটি হ’ল, তিনি কত বড় সতীলক্ষ্মী মেয়ে ছিলেন? তিনি ওপর থেকে দেখেছেন না? এই যে একটা কাজে সাতখানা গ্রামের লাড়া পড়ে গেল, এতে তাঁর পুণ্য, তাঁর ভাগ্যি কাজ করেছে না? সুলোচন রাগ করুক, কিন্তু এর সবটুকু বধ তো আমি তাকেই দিতে পারছি না...”

সুলোচন বাইরে বাইরে কতকটা অনাসক্ত ভাবে নিজের বশোপীতি করিয়া বাইতেছিল, এই সুবিধাটুকু আর হাতছাড়া করিল না। একটু নড়িয়া

বলিয়া বলিল, “নবদীপ কাকা ভাগ্যির কথা বলার মনে পড়ে গেল। ওসব কি আগে কিছু বিশ্বাস করতাম? তর্কবাগীশ মশাইয়ের শিষ্য আমরা, শিখিরেছিলাম—এক আছে প্রকৃতি আর আছে পুরুষ, বাকি সব বাতিল; ও সব যাগযজ্ঞ, পূজো-পার্বণ, ঘটক-পুরুত—সব বুজুকি। গণৎকার তো তাঁর ত্রিসীমানার মধ্যে আসতে পারতো না। তাঁর কাছ থেকে সেই খাত পেয়েছিলাম, পরলোকও মানি নি, ভাগ্যিও মানি নি, নিজের অহংকারেই কাটিয়ে বাছিলাম। কিন্তু আমি না মানলেই তো বিধির বিধান পালাটে যাচ্ছে না। মানাবার যিনি কত! তিনি এমন ভাবে মানিয়ে দিলেন যে...”

কণ্ঠ অশ্রুজ্বল হইয়া আসার আর শেষ করিতে পারিল না। সকলে সাধনা দিল—আর খেদ করিয়া কি হইবে? যাহার যত দিন সুখদুঃখের ভোগ এ সংসারে তাহার এক দিন বেশি থাকিবারও উপায় নাই, এক দিন কমও নয়। তিনি পুণ্যবতী ছিলেন, ভালোই গিয়াছেন; এখন, যে কুচোকাচা-গুলিকে রাখিয়া গিয়াছেন সেগুলির মুখ চাহিয়া সব সহ করিয়া যাইতে হইবে, ইত্যাদি।

হুলোচন নীরবে সব শুনিয়া গেল, তাহার পর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “অথচ সে গণৎকারটা সবই বলে গেল, স্পষ্ট না বলুক, একটু ঘুরিয়ে বললে, তা তখন যদি বিশ্বাস করে একটু ভালো করে শুনি তো একটা কাটান-টাটান হ’তে পারে। কিন্তু কিছুই কখনও আমল দিই নি—বিভ্যাল বকছে বলে খেদিরে দিলাম ব্রাহ্মণকে, এখন...”

আবার গলা ধরিয়া আসার ধামিয়া গেল। নবদীপ বলিলেন, “যাক, শোকের আলোচনা করে আর মন ধারাপ করবার দরকার নেই। যত্নশক্তি যাক্ষের বদলারই, এখন ভগবানের ওপর ভরসা রেখে চলো, তিনিই সব সামলে দেবেন। বা হরে গেল তার জন্তে আর...”

হুলোচন আর একটা নিকপায়ের দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “বা হরে গেল তার জন্তে তো আমি ভাবছি না নবদীপ কাকা, সে তো হরেই গেল; তর্ক-বাগীশ মশাইয়ের নিকাই ছিল—গতত শোচনা নাস্তি; বা বাকি আছে, স্পষ্টাকরে তা দেখতে পাচ্ছি ঘটবেই—তারই জন্তে এখন ভাবনা। শেবকালে বুড়ো বয়সে কি এই ছিল কপালে—উক্!”

সকলেই দুঃখ না করিতে জেদাজেদ করায় সেদিন কথাটা ঐ পর্যন্তই রহিল।

নবীন দত্ত দিন পনেরর অস্ত্র বাহিরে নিজের কি কাজে গিয়াছিল, কিরিয়্যা আসিলে খুলোচন রহস্তটা আর একটু ভাঙিল। বলিল, “বতই মিলিয়ে দেখছি, ততই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, নবীন। শাস্ত্র বলি তো একে, সবার মুখেই এক কথা। আর আশ্চর্য, ঠিক এই কথাটিই সে লোকটাও হাত-গুনে বলেছিল। তখন তো আর এসবে বিশ্বাস ছিল না। নেহাৎ—‘হাতটা দেখি এক বার’ বলে ফ্যাচাখেউ করে তুললে, দিলাম বাড়িয়ে—বড় বড় করে বকে গেল, গুনে গেলাম। তার পরে যখন ফললো, চোখ খুলে গেল। ভগবান যেন চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন—‘হ্যাঁ, বড় নাস্তিক হয়েছিল? তবে দেখ্’।”

ধীরে ধীরে হাঁকা টানিতে লাগিল। কথাগুলার মধ্যে উদ্দেশ্যের কোন সন্ধান না পাইয়া, কোন্ কান্কে সেটা বাহির করিয়া লইবে নবীন দত্ত মনে মনে তাহারই উপায় খুঁজিতেছিল, খুলোচন নিজেই সেটা আরও পরিষ্কার করিয়া দিল। হাঁকাটা সরাইয়া চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া বলিল, “স্পষ্ট বললে হে—দ্বিতীয় বার দার-পরিগ্রহ; হস্তরেখা বলছে, কোন উপায় নেই।...একেই মানি না ওসব, তার ওপর ওরকম অলঙ্কারে কথা গুনে আরও ভক্তি গেল চটে; বললাম—‘পঞ্চাশ পেরিয়ে এখন বাটের ধাক্কা চলেছে, দ্বিতীয় বার দার-পরিগ্রহ মানে?’...ভাগিয়ে দিলাম। মাসখানেকও গেল না, গিন্নী বাদ লাগলেন। কে জানতো বলো এ সব? এখন এই হাতে হাতে প্রমাণ, বিশ্বাস রাখা করেই বা কি করি বলো?”

• নবীন দত্ত চেনে, ব্যাপারটা বুঝিল। বলিল, “কথায় বলে, ‘দৈবং কেন বাধ্যতে?’ আমরা না মানলেই তো হবে না দাদা। বলে—যা ভবিষ্যি...”

খুলোচন বলিল, “তবে ভবিষ্যি বলেই যে এক কথার বেনে নিয়েছি এমন নয়। গিন্নীর কাজটা শেষ হ’লে আরও ক’জনকে দেখালাম হাতটা—দেখি না, যদি একটা লোকও ‘না’ বলে। উহ, সব শেষালের এক রা!”

নবীন বিজ্ঞের মতো বলিল, “তবেই বুঝুন, সবার মুখেই এখন এক কথা...”

“হুহু এক কথা, তবে আর বলছি কি? সবার কাছে এক এক কলস লিখিয়েও রেখেছি, এই দেখ না।”

খুলোচন উঠিয়া গিয়া একখানা কাগজ লইয়া আসিল। ইংরেজি, সংস্কৃত বাংলায় সাত আটজন লম্বা লম্বা পদবীধারী জ্যোতিষী-পণ্ডকারের অভিমত—

দার-পরিগ্রহ অনিবার্হ। নবীন দত্তের কোথায় একটা হাসি ঠেলিয়া উঠিতে-ছিল, কিন্তু হাসিকে আঁসার্য দিলে সে সুলোচনের মস্ত্রী হইতে পারিত না। অভিমতগুলোর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নীরবে বসিয়া রছিল। একটু পরে সোজা হইয়া বলিয়া বলিল, “একটা কথা বাদ-দিয়াছেন, তাই দেখছিলাম।... আপনি যা আপনভোলা লোক!”

সুলোচন একটু উৎসুকভাবে প্রশ্ন করিল, “কি আবার ছাড়তে দেখলে তুমি? পাঁচ জনে আমার ঘাড়েই ফেলবে জেনে তো লিখিয়ে পৰ্ব্বত নিলাম,—ভাববে বুড়ো বয়সে শখ হয়েছে। এদিকে আমি যে কী এক সময়্যায় পড়ে গেছি...”

নবীন দত্ত তিরস্কারের স্বরে বলিল, “ঘটনাটা ঘটবে কবে সেটা জেনে নিতে হয় তো? জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ দৈবাধীন ব্যাপার; যে সময় ঘটনাটি ঘটবার, না জেনে বোধ হয় লজ্বন হয়ে গেল। সেই মানলেন, অথচ শুভ কাজে একটা প্রত্যাবার্য দোষ ঢুকে রইল...”

সুলোচন যেন একটা বিধায় পড়িয়া কি চাপিতে চেষ্টা করিতেছিল, অবশেষে সেটুকু কাটাইয়া উঠিয়া বলিল, “করেছিলাম জিগ্যোস নবীন, অর্থাৎ যত দেরি হয় ততই তো ভালো?—তাই করেছিলাম জিগ্যোস, এক জন তো বলে মাংসখানেকের মধ্যেই করতে হবে। তা কখন পারা যায়? তুমিই বলোনা?...কেউ আবার বলেছে ছ-মাংস লাগবে। মোট কথা, সময় নিয়ে সবার মতের মিল নেই দেখে ভাবলাম শুটা আপাততঃ হাতে রাখা যাক, দু-দিন পরে. এক জন ভালো জ্যোতিবীকে দেখিয়ে ঠিক করা যাবে, তাড়া কিসের?...তা তিন্ন তুমিও ছিলে না, মনটাও এই দু'গ্রহে পড়ে ঠিক নেই...”

নবীন দত্ত বলিল, “অবিশ্টি এ যা বলছেন, এ একটা সুবৃষ্টির কথা,—যখন সময় নিয়ে ওদের সবার মিল হচ্ছে না তখন একটা ভালো লোক দিয়ে অন্তিম ঠিক করে নেওয়াই ভালো দাদা, আমার আছেও জানা ভালো লোক—বক্তৃ-পল পৰ্ব্বত শুনে বলে দেবে। কিন্তু একটা কথা বলিয়ে নোব তবে এ কাজে হাত দোব দাদা;—সে যা বলবে সেটি মেনে নিতে হবে। তুমি রাগ করবে করো দাদা, আমার বিশ্বাস তোমার নিষ্ঠার অভাবেই বৌদি আমাদের অকালে ছেড়ে গেলেন। হয় লম্ব নিয়ে, নয় অস্ত্র কোন দুটিনাটি নিয়ে একটা কিছু বিগ্রি হয়েছিল, নইলে তাঁর কি এটা বাবার বয়স? আজ তাঁকে বিদায় বিদায় কি নতুন বৌদি করে আনবার কথা আমার?”

নবীন দত্ত চোখে কৌচর খুট দিল। তামাক টানিতে টানিতে স্থলোচন হালদারও একবার চোখের কোণগুলো মুছিয়া লইল।

দু-দিন পরেই নবীন দত্ত সন্যস্তন গোসাঁই নামে একজনকে আনিয়া হাজির করিল। বলিল, “পণ্ডিতপাড়ায় বাড়ি, নামী গুণী।”

গোসাঁই অবিখ্যাসের অল্প স্থলোচন হালদারের উপর গোটাকতক কাটা-কাটা বুলি বাড়িয়া হাতটা লইয়া যত-দূর সম্ভব দূরে ঠেলিয়া ধরিয়া তীর্থক নেত্রে চাহিয়া রহিল। অনেক বুলি আওড়াইল, অনেক আঙুল নাড়িল, তাহার পর আবার গোটাকতক বুলি আওড়াইয়া বলিল, “তুই মাস, আট দিন, সতের ঘণ্টা, তেইশ মিনিট, চার সেকেন্ড, সাত পল, তেরো অম্বপলের মধ্যে বিবাহ অনিবার্হ!”

নবীন নিতান্ত কৌতূহলবশে একটা পাঁজি আনাইল। হিসাব করিয়া দেখা গেল ঠিক ঐ সময়ে একটি বিবাহের দিন পাওয়া যাইতেছে। নবীন বলিল, “দাদা, এতেও তুমি যদি গণনা বিশ্বাস না করো তো কি বলবে? এ লগ্ন হাত ছাড়া করলে আবার একটা দুর্বিপাক এনে ফেলবে। বিধির নির্দেশ যখন এত স্পষ্ট, তখন আর অমত কোরো না তুমি, দোহাই।”

স্থলোচন গোসাঁইকে পাঁচটি টাকা বিদায় দিয়া চক্ষে কৌচর খুট দিয়া বলিল, “ওক্, এতও লেখা ছিল কপালে!”

গণংকারে বিশ্বাস করে না এমন চ্যাংড়ার সংখ্যা গ্রামে ক্কা অল্প নয়। নবীনের পরামর্শে শুভ কাজটা যথাসম্ভব সংগোপনেই হইল। তবে বৌভাতের দিন স্থলোচন আবার বেশ এক চোট ঘটা করিল। ব্যবস্থা করিতে, নেমন্তন্নর—কর্দ করিতে পাড়ার গণ্যমান্তেরা একত্র হইয়াছে, কেত্রমোহন, নবদীপ, আরও সব। নবীন দত্তও আছে।

নবীন বলিল, “রাজি কি করতে পারি? এক হাত এগোন তো সাত হাত পেছিয়ে যান।...এখন শুভ কাজটা স্থলোলোর ভালোর উৎসবে গেলে ঠাট্টা যায়।”

কেত্রমোহন গড়গড়া থেকে মুখটা সরাইয়া বলিল, “যাবে উৎসবে। কত বড় সভাপ্রসঙ্গী ঘরে এসেছেন! এতো আর অল্প কেউ নয়, আমার সেই মা-ই। স্থলোচন সেদিনকার ছেলে, শাস্ত্র না মাহুক—স্ত্রীর যেমন সেই এক স্বামী, পুরুষেরও ঠিক তেমনই সেই একই স্ত্রী কি না, শুধু জিজ্ঞাস্য বৃত্তি নিয়ে আসেন...”

সুলোচন বলিল, “আর অবিধানের পাট উঠিয়ে দিয়েছি, কেতুকাবা, বা-শিকু পেলাম। আভিকের বংশ আমরা, ভরুবাগীশ বশাই যে কী নাস্তিকতার বিষ ঢুকিয়ে গিয়েছিলেন যনে!...”

চারিটি আঙুল দিয়া চক্ষের জল মুছিয়া একটি বুকভাঙা দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিল।

[এবারী, অগ্রহায়ণ ১৩৪২]

কালস্য গতিঃ

লেখা চাই।

কিন্তু কল্পনার সে মুক্ত আকাশ-বিহার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সেখানে এলয়ের ঘনঘটা, স্কুয়ার সাহিত্যের অল্প অভিযান বিড়ম্বনা মাত্র। এই আতঙ্কে-অবরুদ্ধ মনকে দিয়া সৃষ্টি করাই কি করিয়া? ওপার হইতে ভাগিন আসিতেছে ঘন ঘন অমোঘ ছংকারে। এই যে ‘গৃহীত ইব কেশেবু মুকুনা’ অবস্থা, এতে বরং একটু পরকালের চিন্তা করাই শাস্ত্র-সংগত, লেখার কথা ভাবিব এমন অবসর কই? কিন্তু লেখা চাই-ই।

আকাশ তো গিয়াছেই, যেটাকে ভূতল বলা হয়, সেটাও ত্যাগ করিয়া পাতালে আশ্রয় লইয়াছি। পাতাল তুনিভ্যম্ মৃত্যুর দোসর। সম্পূর্ণ না হউক, কথটা অর্ধসত্য তো বটেই। ভাবিয়াছি, দেখাই যাক না—এই সন্দেহ সান্নিক মৃত্যুর নিকট হইতে পলাইয়া শব্দহীন হিম্মল্ল অর্ধমৃত্যুর আশ্রয়ে কোন একটা সুরাহা হয় কি না।

হেয়ালি নয়, সত্যই বোমার ভয়ে নিচের তলা আশ্রয় করিয়া আছি। নিচের তলা বলিলে ব্যাপারটা বেশ পরিষ্কার না-হইবারই কথা। যুগ যুগ ধরিয়া এতদিন পর্যন্ত লোকে যেটাকে ‘নিচের তলা’ বলিয়া আসিয়াছে, তবু বাঁচিবার আশার তাহারও নিচে একটি গৃহ নির্মাণ করিতে হইয়াছে। মাহুদের উপরের গতি শেষ হইয়াছে। তবু মাহুবই তো! সে চলিবেই। তাই আধুনিক প্রগতির লক্ষণ অধোগতি; ধরবায়িও সেই তালে পা ফেলিতে আরম্ভ করিয়াছে। এতদিন আকাশ লক্ষ্য করিয়া উঠিতেছিল, এবার তাহার লক্ষ্য পাতাল।

ক্রমাগতই অবাস্তব কথার আসিয়া পড়িতেছি। কি করি? অগ্নির আঁচ হইতে নিজেকে অপসারিত করিয়াও গায়ের জ্বালা মিটিতেছে না। কায়কল্পটা আপাততঃ বোমাও নয়, সাইরেনও নয়—বদিও উভয়ের সঙ্গেই একটা মূল সন্ধ আছে। শরীর এবং মনকে সংকুচিত করিয়া লইয়া সম্পাদক মহাশয়ের তাগিদ মিটাইবার যোগাভ্যস্ত করিতেছি, আমার ভূতলাশ্রিত পরিবার-মহলে একটা গোলযোগ উঠিল। মা বলিতেছেন, “জানি না বাছা, কেমন যেন কালেরই দোষ! ছেলে কোথায় তার ঠিক নেই, তার মুখের কথা হ’ল—‘সেপাই হব, যুদ্ধ করতে যাবো!’...তা যাবি, সব বীরপুরুষ হয়েছিল, আটকাবে কে? কিন্তু তার আগে আমার যেতে দিন ভগবান...”

কত্যা বোধ হয় স্কুল হইতে এইমাত্র ফিরিয়াছে—পড়ার ঘরের ভিতর হইতে উত্তর দিতেছে, “কথায় কথায় একালের নিম্নে তোমার একটা রোগ দাঁড়িয়েছে, ঠাকুমা। না, যুদ্ধে যাবে কেন? চারিদিকে অস্ত্রাঘাতের আশঙ্ক লেগেছে, ও তোমাদের কালের কতীদের মতো বসে বসে চণ্ডীমণ্ডপে তামাক পোড়াতে শিখুক, আর...”

আমার কনিষ্ঠ পুত্র দোতালার কি একটা আবদারের সঙ্গে পরিত্রাহি চীৎকার করিয়া যাইতেছে। স্পষ্ট শুনিতে না পাইলেও বুঝিলাম, সমস্ত ব্যাপারটা তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া।

ঠাকুরমা-নাতনীর কথা-কাটাকাটি ক্রমে রসিকতার গড়াইয়া পড়িলেও, উহারই মধ্যে বেশ ক’কালোও। আমার বয়সটা যারই বেশি নিকটবর্তী; মাথায় বোমা পড়া অপেক্ষা যেমের মাথায় এই সব আকস্মিক আধুনিকতার সমাবেশ করা বিপজ্জনক মনে করি না। এরা কি দেশটাকে রাতারাতি নব্য তুর্কী করিয়া গড়িয়া ফেলিতে চায় নাকি? আমাদের এই পাতাল-প্রবেশের সুযোগে ইহারা আরও কি সব বিপ্লবী মতলব আঁটিতেছে, কে জানে? নিচে হইতে মলাটাকে রাশতরী করিয়া বলিলাম, “কমলী, সব শুনিছি। মনে হচ্ছে, মিছেও তা হ’লে বোধ হয় নারী-বাহিনী কি ঐ রকম একটা কিছু তোমের চুল্লীর আগতির ব্যাপারে নাথ লিখিয়ে এসেছিল। কাল থেকে স্কুল বাওয়া বন্ধ, বাড়িবাড়ি হয়ে বাচ্ছে। একটা এ-আর-পি-তে নাম লিখিয়েছে; আমার মাথায় ঠিক নেই, এর ওপর যদি তোম মুখে ঠিক হয়...”

কত্যা নাতা হুয়ারের কাছে উপস্থিত হইল, বোলে কখনও গরাম লিখপত্র। ভর্তম-সহকারে বলিল, “সামলাও বীরপুরুষ ছেলেকে, নাহেহীল,

করে দিচ্ছে। সোষ ঠাকুরপোর, ওকে সঙ্গে করে নিয়ে হাঁসপাতালে গেছে, আরও কোথায় কোথায় নিয়ে গিয়ে লড়াইয়ের সব যন্ত্রপাতি, উড়োজাহাজ, গ্যাস-বুখোশ—এই সব দেখিয়েছে। ভাইপোর এখন শখ হয়েছে, সেপাই সঙ্গে লড়াই করতে যাবো, 'আপানীদের মারবো।' পায়ে একটা জ্বাকড়া জড়িয়ে চোট-খাওয়া সেপাই হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, অলক্ষ্য বলে যা যেই সেটা কেড়ে নিয়েছেন, আর..."

বলিলাম, "তোমাদের কাণ্ডখানা কি গো! একটা তিন বছরের শিশু লড়াইয়ে বাবে বলে 'বারনা ধরেছে, মা, ঠাকুমা, বোন সবাই মিলে বাড়িতে ডাকাত-পড়া লাগিয়ে দিয়েছ! আমি মনে করি, বড়শোকাই বুঝি বা বন্দুক খাড়ে করে যুদ্ধ করতে চললো; যাও, বাজে গোলমাল বন্ধ করা গিয়ে।"

ছেলেটা আমাদের কথাবার্তা শুনিবার জন্য গলাটা নরম করিয়াছিল, খুঁটী ধরিয়া রাখিয়াছিল, তাহাকে ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে প্রশ্ন করিলাম, "বড় বীর হয়েছে, না? সেপাই সঙ্গে লড়াইয়ে যেতে হবে?"

কথাটা সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

উহার মাতাকে বলিলাম, "নিয়ে যাও তোমার অভিমত্যাঁকে, আমার বিরক্ত কোরো না, একটা কাজ নিয়ে বসেছি।"

বলিল, "বলছি—দেখ একটু, কোনমতেই থাকবে না আমাদের কাছে, ঠাকুরপো ওর মাথায় যে কি খেয়াল সাঁধ করিয়ে দিয়েছে! নিজে তো বোমা মাথায় করে হুড়ুদুম করে বেড়াচ্ছে এ-আর-পি নিয়ে, কে যে সাহসীরা ভাইপোকে, ছিটির পাট পড়ে আছে।"

বলিলাম, "কমলীকে দাওগে, আমার এখন মরবার কুদলং নেই, যাও।"

উপরে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে ছেলে খুঁর চড়াইল এবং মায়ের কাছে একটা চাপড় খাইয়া সেটাকে, সঙ্গে ঠেলিয়া তুলিল, ঘৃণা—"নড়াই-করা ছেপাই হবে, বোমা কখন ফাটবে?"

রাগ চাপিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু মনটা ক্রমেই অবিকতর উক হইয়া উঠিতেছে, একটা সামান্য শিশু বেঁধের মূলে—এ জানটুকুতে কল হইতেছে না, মায়ের মতোই নবম খুঁটীর উপর মনটা বিবাহিয়া উঠিতেছে, কলম এক পদও অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। কমলীর গলা শুনিতেছি, ছেলে

ভোলাইবার সমস্ত কলা-ই তাইয়ের উপর পরীক্ষা করিতেছে বেচারি; তাইয়ের সেই এক কথা—“নড়াই-করা ছেপাই হুবা, বোমা কোথায়?”

মা আরও চটিয়াছেন, একালের সঙ্গে আরও নানারকম ব্যাপার টানিয়া আনিয়াছেন। ওর নিজের মাতাও ক্রমেই অধিকতর উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে, তাহার মস্তব্যের মধ্যে ছেলের পিতার উল্লেখ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। বোনও এক-একবার বিরক্ত হইয়া কাঁঝিয়া উঠিতেছে। সকলের উপর ছেলের কর্তৃত্ব, যেমন উৎকট তেমনই উচ্চ—সব মিলিয়া বাড়িটা একটা ছোটখাট কুরুক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কলম রাখিয়া দিলাম। হাঁকিলাম, “কমলী, নিয়ে আর হতভাগাকে, যুদ্ধের খানিকটা নমুনা ওকে দেখাই—অতিষ্ঠ করে তুলেছে! আনলি?”

মা চোঁচাইয়া উঠিলেন, “খবরদার, এর ওপর মারধোর করবি না শৈল, ছেলে আবদেদে কাঁহুনিতে হারান্ন হয়ে উঠে এমনিই ভিন্নি যাওয়ার দাখিল হয়েছে। আমার যেতে দে, তারপর যা খুশি করিস, বলতে আসবোনা।”

রাখিয়া বলিলাম, “তা হ’লে কি করতে বলো? ঠাণ্ডা কথায় তো তোমরাও হার যেনেছ। বাড়িতে কাক-চিল বসতে দিচ্ছে না, এমন করে কতকণ...”

উহার মাতা কমলীর নিকট হইতে ছেলেটাকে টানিয়া লইয়া এবার একেবারে নিচে নামিয়া আসিল, আমার পায়ের নিকট ধপ করিয়া বসাইয়া দিয়া চাপা স্বরের স্বরে বলিল, “কেন, যত সব আদাড়ে গল্প লিখে লিখে দেশের ভাবৎ বুড়োদের মন ভোলাচ্ছ, একটা শিশুকে ঠাণ্ডা করবার হদিস জানো না? না, তাতে যে গেরস্তর একটু উৎসাহ হবে!”

মেজাজের উপর এখতিয়ার ছিল না, একটা রাগারাগি করিতে যাইতে-ছিলাম, কিন্তু হঠাৎ পায়ের কাছে ছেলেটার যুদ্ধের উপর দৃষ্টি পড়ায় নিজেকে সামলাইয়া লইলাম। উপর হইতে সহসা এই প্রায়াক্রমিক পাতালপুরীতে আসিয়া এবং বাপ-মায়ের উগ্র দৃষ্টির মাঝে পড়িয়া সে যেন কিংকৃতকিম্বাকার হইয়া গিয়াছে। কান্নাটা একেবারে খামিয়া গিয়াছে এবং অবলম্ব্য কান্নার আবেগে মুখটা সিঁহবর্ণ হইয়া গিয়াছে; উদগত অঙ্গকে ঠেলিয়া রাখিবার জন্য এক-একবার ঢোক গিলিতেছে এবং এক প্রকার অসহায় আত্ম দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া আছে।

অবস্থাটা যেমন করুণ, তেমনই আশঙ্কাজনক। আমি উহার মাতাকে বলিলাম, “আচ্ছা, যাও, সবার মুরোদ বোঝা গেল; একটা ছেলেকে ঠাণ্ডা করতে হবে, সেখানেও খর্যা না হ’লে চলবে না।”

উত্তর যাহা পাইলাম, তাহা এ কাহিনীর পক্ষে অবাস্তব বলিয়া লিখিবদ্ধ করিলাম না।

খোকার জননী চলিয়া গেলে উহাকে উঠাইয়া লইয়া নরম কঠে শ্রম করিলাম, “কাঁদছিলে কেন খোকা? কি হয়েছে? গঙ্গা শুনবি একটা?”

খোকা একবার ভালো করিয়া ফোঁপাইয়া লইয়া রুদ্ধ দমটাকে মোচন করিল, উত্তর করিল, “হঁ।”

ঔষধ ধরিয়াছে দেখিয়া উৎসাহের সহিত বলিলাম, “তা বেশ তো, শুনবি, এর ক্ষণে কান্না কেন? এমন সব বেয়াকুলে, খোকা গঙ্গা শুনবে, তাকে উলটে ধমকাচ্ছে! আর, কোলে আর।”

খোকা উঠিয়া কোলে গুছাইয়া বলিল। আর কালক্ষেপ না করিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিলাম।—

“মন্ত এক তেপান্তরের মাঠ। তার এক ধারে প্রকাণ্ড এক অশথ-গাছ; কতদিন থেকে যে এক ভাবে এক আয়গায় দাঁড়িয়ে আছে, কেউ বলতে পারে না। সেই আন্তিকালের অশথগাছে—বুঝেছি—খোকা?—এক থাকতো ব্যাকমা আর এক থাকতো ব্যাকমী। আহা, সবাই তো চায় আমাদের খোকার মতো লক্ষী একটি ছেলে হোক? কিন্তু দিন যায়, মাস যায়, বছর ঘুরে যায়, ছেলে আর তাদের হয় না। দুঃখে, মনের কঠে দুজনে একটা ভালের গুপ্ত বসে, হাপুস নয়নে কাঁদে—হাপুস নয়নে কাঁদে—হাপুস নয়নে...”

খোকা মুখ নিচু করিয়া শুনিতেছিল, হঠাৎ যেন মনে হইল, তাপা কোঁপানির আওয়াজ শুনিলাম। রচনা যে এত হৃদয়স্পর্শী করিয়া তুলিতে পারিয়াছি, ইহাতে পুলকিত হইয়া মাথাটা নামাইয়া বলিলাম, “তুইও কাঁদছিল নাকি খোকা? কান্না কিসের? একুনি হবে ওদের ছেলে।”

খোকার ঠোঁটটা কাঁপিয়া উঠিল, কান্নার ভাবটা আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিল, “কুড়ুর গঙ্গা ছুনবো, এলোপেলেনের...”

বুড়ো বয়সের বাস্তবিক, শুদিকে বা এখনও এতুগের কথা লইয়া পরপর করিতেছেন।

কতকটা রচনার অমর্যাদাজনিত নৈরাশ্রে, কতকটা এই এক কোঁ ছেলের বেয়াড়া জিন্সে খানিককণ বাক্‌ফুর্তি হইল না। ইচ্ছা হইল, বাড়ি ধরিয়া একটা আছাড় দিয়া এরোপ্লেনের খানিকটা আশ্বাদ দিয়া দিই—নগদ নগদি। নিজেকে অনেক কষ্টে সংযত করিয়া লইলাম। একটু চিং করিলাম, তাহার পর স্থির করিলাম, এমন উগ্র গল্পের অবতারণা করিব যে আতঙ্ক মিটিতে কিছুটা দিন কাটিয়া যাইবে। বলিলাম, “বেশ, এরোপ্লেনে গল্পই বলছি, এ আর এমন শক্ত কি? তবে শোন”—বলিয়া হুরটা যথাসম্ভব গুরুগম্ভীর এবং চক্ষু যথাসম্ভব আয়ত করিয়া আরম্ভ করিলাম।—

“তুই তখন যুমুজিলি খোকা। হঠাৎ কড়কড় কড়কড় কড়াং! আকাশ যেন চৌচির হয়ে কেটে গেল। সে যে কি ভয়ংকর আওয়াজ, তাকে কি বলবো! খড়মড়িয়ে সবাই উঠে পড়ে পড়ি-তো-মরি করতে করতে গেলাম ছুটে। ছাতে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ! চড়কগাছ দেখিস নি তো কখনও? দেখাবো একদিন, সেই আকাশ পর্যন্ত উঠে বনবন করে ঘুরতে থাকে। ছাতে উঠে সবার চক্ষু চড়কগাছ! হবে না? একটা নয়, হুটো নয়, একেবারে পঞ্চাশখানা এরোপ্লেন আকাশে উঠে...”

খোকা শোধরাইয়া দিল, “হাজাল খানা।”

কটু এবং গুরুপাক হইলেও ডে’পোমিটা হজম করিয়া গেলাম। মনের রাগ মনে চাপিয়া বলিলাম, “ই্যা, ঠিক বলেছিল, হাজার খানা এরোপ্লেন আকাশে উঠে সে কি তর্জন-গর্জন আর ডানা ঝাপটানি! এরোপ্লেনে এরোপ্লেনে সমস্ত আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল, আর ভালগাছের মতো বোমা সব আশ্রন ছড়াতে ছড়াতে হুমদাম করে ফাটতে ফাটতে নিচে এসে পড়তে লাগলো। যেখানটা পড়ছে, বুঝেছিল কিনা খোকা, ভেঙে-চুরে একাকার করে দিচ্ছে। ওদিকে বোমা-ফাটার বিদকুটে শব্দ, এদিকে দোভলা, তিন-ভলা, চারভলা বাড়ি পড়ার হড়মুড়নি, ভয়ে আতঙ্কে আমরা তো...”

খোকা গলাটা একটু দোলাইয়া নাকী হুরে অহযোগ করিল, “আমাদের বাসি পললোনা?”

কি অলকণে কথা কচি ছেলের! তবু, আর বাটাইলাম না, বলিলাম, “না, আমাদের বাড়ি পড়বে কেন? আমাদের বাড়ি খোকায় মতন লম্বী ছেলে রয়েছে, ঠাকুর বাটিয়ে দিলেন।”

খোকা তেমনই অহযোগের স্বরে মন্তব্য করিল, “ঠাকুর ডুটু।”

প্রসন্নটা আর না বাড়াইয়া বলিলাম, “তারপর কি হ’ল শোন খোকা। আপানীরা যখন ওপরে খুব বাড়াবাড়ি লাগিয়েছে এই রকম, নিচে থেকে দশ হাজারখানা এরোপ্লেন বন্দুক ছুঁড়তে ছুঁড়তে তরতর করে ওপরে ওঠে খেল। সঙ্গে সঙ্গে ওদের আরও এরোপ্লেন সব এসে পড়লো, এদেরও আরও হাজার হাজার এরোপ্লেন উঠলো, ওদেরও আরও সব কোথা থেকে এসে জুটলো, আরও এদের, আরও ওদের—এরোপ্লেনে এরোপ্লেনে আকাশে আর এতোটুকু জায়গা নেই! তারপরে বেধে গেল ভীষণ বৃষ্টি, সে যে কী ভীষণ তোকে কি বলবো খোকা! হাজার হাজার বোমা কাটছে, লাখে লাখে কামানের গোলা ছুটছে, কীকে কীকে এরোপ্লেন ডানা ভেঙে ওলটাতে পালটাতে কত বাড়ি ভেঙে, কত ঘোড়া, মোষ, মানুষ যেরে নিচে এসে পড়ছে, হাজার হাজার মানুষ ওপর থেকে ছিটকে যে কোথায় গিয়ে পড়ছে ঠিকানা নেই, কাকের মুণ্ড উড়ে গেছে, কাকের পা নেই, কাকের হাতের একখানা কেটে বেরিয়ে গেছে, কাকের বুকের ওপর গোলা লেগে হাড় পাঞ্জরা সব...”

একবার আড়চোখে চাহিলাম, ওৎসুক্যে ভরা কিন্তু ভরলেনহীন দুইটি চকু আমার মুখের উপর স্তম্ভ করিয়া খোকা বসিয়া আছে, ধামিতে সামান্য যে একটু রসভঙ্গ হইল তাহাতেই খানিকটা অর্ধবৃত্তভাবে ভাগানা দিল, “হঁ, ভালপল?”

বিরক্তিটা আর চাপিতে পারিলাম না। না হয় কান্নাটাই ধারিয়াছে, কিন্তু এত কালোও করিয়া গর বলিবার তো আমার আরও কিছু উদ্দেশ্য ছিল। আর, বিভীষিকা-সৃষ্টির আমার যতটুকু ক্ষমতা তাহারও চরমে আসিয়া পড়িয়াছি, সবই জলে পড়িতেছে তো! ভরের সকার কোথায়? গরুটা ওটাইয়া লইলাম, বলিলাম, “তারপর আর কি? অত হলুদুলের মধ্যে কি কেউ বাইরে দাঁড়িয়ে বেশিক্ষণ তারানা দেখতে পারে? আমরা তাড়াতাড়ি হুড়মুড়িয়ে নেমে এসে এই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। মাঝে মাঝে গুমগাম শব্দ শুনিছি, আর ঠাকুরকে বলছি, ঠাকুর, আমাদের সবাইকে বাঁচিয়ে রাখো।”

খোকা অগ্রসর যুখে একটু চূপ করিয়া রহিল। তাহার পর আমার মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, “আল কাকা?”

উদ্বেগটা বুঝিলাম, এক কোথায় একটু লজ্জাও অস্বস্ত্য করিলাম। কাকা ওর আদর্শ, ওর হীরা, তাহাকে আমাদের—পলাতকদের—বলে টানিয়া আর

ওকে নিয়ন্ত্রণ করিতে মন সরিল না। বলিলাম, “না, কাকা তোমার এলোন সেও একখানা এরোপ্লেনে বসুক-বোমা নিয়ে ওপরে উঠে গেল আরু, আপনি ঘের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে দিলে।...এইবার তুমি একটু নামো দিকিন খোক আমার কাজ করতে হবে।” একেবারে গোলমাল কোরো না, শুনলে যে যুদ্ধের ঘটনাটা? ওরা আবার কাঁহুনে ছেলেরের বেশি করে খুঁজছে, এক কান্নার আওয়াজ পেয়েছে কি হেঁ। মেরে নিয়ে গিয়ে সে—ই একেবারে আকাশের ওপর—।...যাও, নামো।”

নিশ্চিন্তে নিরিবিলিতে লেখা লইয়া কয়েক ছত্র অগ্রসর হইয়াছি, আবার ফৌপানি! ধৈর্য ধরিয়া আছি, ফৌপানি স্পষ্টতর কান্নায় উঠিল। কলম রাখি সংযত বরে প্রশ্ন করিলাম, “কি হ’ল আবার?”

কোন উত্তর নাই, কান্নাটা আর এক পর্দা উঠিল মাত্র। আর ধৈর্য ধরিয়া রাখা যায় না। চিন্তাম্রোতে বাধা পড়িয়া লেখার খেই হারাইয়া ফেলিয়াছি। অপেক্ষাকৃত অসংযত বরেই প্রশ্ন করিলাম, “কি হ’ল শুনি, আবার কান্না কিসের?”

“কাকাল ছদ্মে যুদ্ধ করতে যাবো...”

গারে যেন আশুন হুড়াইয়া দিল; মনে হইল, সমস্ত শরীরটাকে বোমা করিয়া লইয়া এ ছেলের গারে ফাটিয়া পড়িতে পারি তো কতকটা রাগ মেটে। শাস্তকর্মেই বলিলাম, “কাকা যুদ্ধ করতে যাব নি, কেরোসিন তেল কিনতে গিয়ে কিউ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।”

কণ্ঠস্বর আরও এক পর্দা উঠিল, “কাকা যুদ্ধ করতে গেছে...”

আর রাগ চাপিতে পারিলাম না, চেয়ারটা একটু সরাইয়া লইয়া ঠাস ঠাস করিয়া কয়েকটা বেশ ওজনহীন চড় কবাইয়া দিয়া বলিলাম, “ঘরেই যুদ্ধের সরঞ্জাম আছে, এই দেখ; আর বাইরে যেতে হবে না কষ্ট করে।”

খোকা ডুকরাইয়া কাদিয়া উঠিল, গলা বা বাহির করিল তাহার তুলনার পূর্বের কান্না কোথায় পড়িয়া থাকে। মুখে ঐ এক বুলি, “যুদ্ধ যাবো, নড়াই-করা ছেপাই হবো...”

উহার মাতা ছুটিয়া আসিল। বলিল, “পারলে না তো? আরি জানি, তোমার দারা এটুকুও হবে না।”

বেরেও ছুটিয়া আসিল। তাহার কথাবার্তা তাহার মাঝের মতোই ক্রমশঃ, শুধু শিকার অস্ত্র একটু ব্যক্তি; দরকার নিকট আসিয়া বিবিত

কঠে শান্তভাবে বলিল, “ওগুলো তোমার খারাপ ছিল বাবা? সর্বদকে! আমি ভাবলাম, বোমা ফাটলো বুঝি! সত্যি, এখনও আমার বুক-বড়কড় করছে!”

মা ছুটিয়া আসিলেন, তিক্তস্বরে বলিলেন, “তুই ছুধের বাছাকে ঐ রকম করে মারলি? ককিয়ে গেছে বে!”

বলিলাম, “ও সেপাই হবে, যুদ্ধে যাবে! চূপ না করে তো আরও ঠাণ্ডাবো, হয়েছে কি এখন?”

মা ঝংকার করিয়া উঠিলেন, “যাবে যুদ্ধে, এমন নৃশংস বাপের কাছে থাকার চেয়ে সে লাখে গুণে ভালো। একটা কচি শিশু বারণা ধরেছে, তা...”

খোঁকা চীৎকার করিয়া চলিয়াছে, “আমি ছেপাই হবো—কাকা গো!...”

মা তুলিতে যাইতেই এমন আছাড়ি-পাছাড়ি খাইয়া পড়িল যে, তিনজনে হসরান হইয়াও বাগ মানাইতে পারে না। সমস্ত শরীর রাজা হইয়া উঠিয়াছে; ঘাম, অশ্রুর সঙ্গে মেকের ধূলা মিশিয়া হালকা কাদায় সর্বাঙ্গ মলিন হইয়া গিয়াছে, এক এক জায়গায় কি করিয়া ছড়িয়া গিয়া রক্তের রেখা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, দারুণ চীৎকারে মুখে কেনা উঠিতেছে, বলি—“আমি নড়াই-করা ছেপাই হবো, বোমা কোথায়? কাকা গো!...”

তিনজনে ওদিকে একেবারে নাকানি-চোবানি খাইয়া যাইতেছে। আমি আমার নিজস্ব পদ্ধতিতে ঠাণ্ডা করিবার জন্ত ছই-একবার অগ্নির হইলাম, কিন্তু তিনজনের ব্যুৎ ভেদ করিতে অসমর্থ হওয়ার শিফল ক্রোধে ওর অতুপস্থিত কাকার উপর ঝাল ঝাড়িতেছি, এমন সময় সে আসিয়া উপস্থিত হইল। এ-আর-পি’র থাকিতে আপাদমস্তক মোড়া, হাতে কাগজে লেপটানো একটা বাঙিল, তাহার মধ্যে, থাকি কাপড়েরই আরও পোশাক-চোশাক কি আছে বলিয়া মনে হইল। ওর চলাক্কেয়া আজকাল সাময়িক কারদার—সর্বত্র শোভা না পাইলেও বোধ হয় অভ্যাসের দোষে সামলাইতে পারে না। ছুরারের কাছে ক্ষুতার গোড়ালিতে ঠুকিয়া যুক্তপদে দাঁড়াইয়া প্রসন্ন করিল, ব্যাপারখানা কি?”

ঝংকার করিয়া বলিলাম, “ব্যাপার অনেক! কি সব আজকালি খেলার মাখায় সাজ করিয়ে বসে আছিল, না শোনে আদর, না মানে ভয়—সেপাই হবো, বোমা কোথায়? নিজে দিলি হয়েছিল, কাকুর বারণ না শুনে কোথায়

বোমা কাটবে, কার ঘর পুড়বে—এই সব নিয়ে রয়েছি, ওকে সামলায় কে চারটে লোকে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে একটা ছেলের পেছনে।”

মাও আমার সঙ্গে বোগ দিলেন। ওর ভাষা কিছু বলিবার সুবিধা পাই না, তবে ভাইঝি বলিল, কিন্তু তাহার মধ্যে কতটা কাকাকে ভিন্নকার আ কতটা আমার অতি-সতর্কতা ও ভীকৃতার প্রতি ব্যঙ্গোক্তি তাহা নির্ণয় কর শক্ত। ওর কাকা অবিচলিত এ-আর-পি পদ্ধতিতে খানিকটা গুনিল আমাদের বকুনির জন্ত চটিয়াছে, কি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, কি খোকার উপর চাপ রাগে সংযত থাক হইয়া গিয়াছে কিছু বোঝা গেল না। গটগট করিয়া আসিয়া খোকার সামনে দাঁড়াইল, গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিল, “কীদৃষ্টি কেন?”

খোকা হঠাৎ ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। কাকার গাম্ভীৰ্য দেখিয়া বা যে কারণেই হউক, ভ্যাবাচাকা খাইয়া গিয়াছে এবং বেশ বোঝা যায়, জোর করিয়া কান্নাটাকে ঠেলিয়া রাখিয়াছে। কাকার প্রশ্নে একবার মুখটা তুলিয়া তাহার পানে চাহিল এবং—“নড়াই-করা ছেপাই হবো, বুড়ু...” —বলিতে বলিতে আবার ডুকরাইয়া কাদিয়া উঠিল।

ওর কাকা সাময়িক বা স্টেজের প্রথম তর্জনীটা উল্টা দিকে বাঁকাইয়া সেই রকম গম্ভীর ভাবেই বলিল, “বেশ, চলে আর।”

আমরা সবাই থ হইয়া কাকা-ভাইপোর অভিনয় দেখিতেছিলাম। উহারা উপরে উঠিয়া গেলে মা শাসাইলেন, “খবরদার, মারধোর করবি নি বলছি, বড়খোকা। তুই আবার ঐ পাগুটে রঙের ছাইভস্ম গায়ে দিলে অর্থাৎ বড় গোঁয়ার হয়ে পড়েছিস।”

বড়খোকা ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, “মারি কাটি বা খুশি হয় করবো। তোমরা আর কথা কয়ো না, চারজন মিলে একটা কুচি ছেলেকে এঁটে উঠতে পারলে না। খালি তুলোয় শুইয়ে ‘বেটের বাছা’ ‘বজ্রের দাস’ করে একেবারে মাটি করতে বসেছ। একটু রক্ত দেখলে, কি একটু আঁচড় লাগলে...”

আনি কতকটা আশঙ্কায় এবং কতকটা লজ্জায় ওরই তরকে হইয়া মাকে বলিলাম, “ঠিক বলেছে, যেমন করে পারুক করুক সারেন্তা।”

ভয়ী কতকটা তরে কতকটা কোতুলে পিছু লইয়াছিল, কাকার শব্দ খাইয়া থাকিয়া গেল।

ভাইপোকে লইয়া বড়খোকা একেবারে ভেতলার ছায়ে নিজের ঘরের

দিকে চলিয়া গেল; নিচে হইতে শব্দ লক্ষ্য করিয়া যতটা বোকা গেল, তাহাতে মনে হইল না, বেশ মোলায়েম ভাবে লইয়া বাইতেছে।

প্রায় আশ বণ্টা তিন কোয়ার্টার হইবে। খোকার কান্না নাই, কোন রকমই আওয়াজ নাই। বড়খোকার মেজাজ আজকাল যেমন রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, খোকারে কোন অন্তরটিগুনি দিয়া থামাইয়া রাখিল কি না, চিন্তা করিতে করিতে লেখায় কখন অভিনিবিষ্ট হইয়া গিয়াছি,—“ওরে সর্বনাশ করেছে, খুন করেছে ছেলেটাকে হতভাগা!”—বলিয়া মা হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। উপর দিকে চাহিয়া আমিও একেবারে শিহরিয়া উঠিলাম।

খোকার মাথার এক খামচা টিংচার আরোডিনে ভেজা মোটা পট্ট বাধা, কপালের ডান দিকের পট্টটা ভিজাইয়া দিয়া একটু একটু রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছে। বা হাতটার আগাগোড়া একটা পট্ট এবং নগিবন্ধে একটা ফাঁস লাগাইয়া হাতটা গলার সঙ্গে ঝোলানো—ভাঙিয়া গিয়াছে। নাকের ডান দিকটার একটার উপর আর একটা আড়াআড়ি করিয়া ক্রেশের আকারে স্টিকিং-প্রাস্টার সাঁটা, ডান নাগারকু দিয়া রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছে। বীভৎস দৃশ্য একটা।

মা ছুটিয়া আসিতেছেন, “ওরে, গুনখুন করেছে ছেলেটাকে হতভাগা, কান্নার আওয়াজও বেরুতে দেয় নি—কি খুনে গোয়ারা!”

খোকার মাতাও চায়ের সরঞ্জাম ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিতেছে, “ও ঠাকুরপো, ও কি করলে! সাড় নেই যে ছেলের!”

ওদিককার ঘর হইতে উহার ভগ্নীও হতবস্ত্র হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে।

ততকালে প্রথম ভয়ের ঝাঁকটা কাটিয়া গিয়া অখবীর নতুন থাকি পাট, থাকি হাকপ্যাণ্ট আর থাকি মোজার বিকে আমার নজর গিয়াছে; তাহার পাড়াইবার নিবিহার—বরং কতকটা দৃষ্ট ভক্তিও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ‘নড়াই-করা ছেপাই’-এর অর্থ বুঝার মুখে হাসি ফুটিয়াছে আমার।

মা আসিয়া পড়িয়াছেন, ওর নিজের মা ও ভগ্নীও আসিয়াছে।

মার বুকিতে বোধ হয় একটু ঘেরি হইল। বুকিয়াই কিছু চেঁচাইয়া উঠিলেন, “খোল; ঈগগির খুলে দে বলছি।...শব্দ। বাবা:, এখনও বুকের বড়কড়ানি ঘোচে নি। কাল উলটে গেল একেবারে! খোল বলছি বড়খোকা,

কঙ্কালের গারে অমন বেশ দেখতে নেই চোখে। বাট! বাট! আর ও বোম্বটেও দাঁড়িয়ে আছে কেমন দেখ না। সে কান্নাই বা কোথায় গেল!”

উহারা উভয়েই ততক্ষণে বাহিরের দরজার দিকে মুখ করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কাকা প্রশ্ন করিল, “কোন হাঙ্গপাতালে ভর্তি হবি রে থোকা?”

অথম সেপাই অকম্পিত কণ্ঠে উত্তর করিল, “বলো হাঁচপাতালে।”

ছুই জোড়া জুতার দর্পিত মশমশানি বাহিরের রাস্তার ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।

[শনিবারের চিঠি, মাস ১৩৪২]

লেখক

মোহিত আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল,—নিভান্ত ঝড়ের মতো না হোক, একটা দমকা হাওয়ার মতো তো নিশ্চয়ই। বলিল, “আজ শৈলেনবাবুকে দেখে এলাম।”

মেকিক্যাল মেসের ঘর। ছয় জনের সীট, কিন্তু এখন প্রায় জন দশেক ছেলে গুলতান করিতেছে। মোহিত-প্রদত্ত সংবাদে ঘরটা এককালে নিবৃত্ত হইয়া গেল। অমর স্টোভে পান্স করিতেছিল, হাত থামাইয়া প্রশ্ন করিল, “কোন শৈলেনবাবু? লেখক?”

মোহিতের নিয়ম হইতেছে কোন অবর সংবাদ দিয়া একেবারে গম্ভীর হইয়া যায়, তখন প্রশ্ন করিয়া করিয়া তাহার নিকট হইতে কথা বাহির করিতে হয়। উত্তরও দেয় সাধারণতঃ অল্প কথায়। অমরের প্রশ্নে একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করিতে করিতে বলিল, “ইয়েস!”

আবার একটু হুপচাপ গেল। মোহিত নির্দিষ্ট ভাবে অবতবাক্যরটা তুলিয়া গইতে ভ্রামল ব্যঞ্জভাবে প্রশ্ন করিল, “কি রকম দেখলেন?”

মোহিত উত্তর দিল না, প্রশ্ন করিল, “কি রকম আলাপ হয় আপনাদের?”

অমর প্রশ্ন করিল, “কি অবস্থার দেখলেন? যানে কি করছিলেন শৈলেনবাবু?”

‘একটা ছোট কাপড় পরে কোমরে পৈতে জড়িয়ে ভেল রাখছিলেন।’

পূর্ণপতি এখন পর্যন্ত কোন কথা বলিতে পারে নাই, শুধু প্রতি কথাতাই তাহার চক্ষু দুইটি বিষয়ে আরও বিস্তারিত হইয়া উঠিতেছিল। আর ঔৎসুক্য চাপিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিল, “খালি গারে ?”

মোহিত ঘোঁরা ছাড়িয়া বলিল, “ইয়েস্।”

“কিসের তেল ?”

“সরবের।”

অমর টোতে পাম্প দেওয়া ছাড়িয়া উঠিয়া আসিল, চৌকিতে বসিয়া সামনে একটু ঝুঁকিয়া প্রশ্ন করিল, “আমাদের এই সরবের ? অর্থাৎ বাজারে যে সরবে পাওয়া যায় ?”

প্রথম দেওয়ালে টাঙানো আশির সামনে দাঁড়াইয়া গলায় টাই বাধিতে-ছিল। ষাড়টা বাকাইয়া টাই-পিনটা দাঁতে চাপিয়া একটু বিরক্তির সহিত বলিল, “But, who the devil is he যে, তেল মাখবার সময়ও তার গারে একটা ওভারকোট চড়ানো থাকা চাই, আর তার তেলের সরবে হবে something quite different from the stuff we know (আমরা বা জানি তা’ থেকে সম্পূর্ণ এক আলাদা জিনিস) ? আপনারা যে হাসালেন মশায়,— he is as much a man as any of us !” (যেমন মানুষ আমরা, ঠিক তেমনি মানুষ তো তিনিও !)

এই ছোকরার উপর সকলেই কমবেশি একটু বিরক্ত। কোন জিনিসেরই গাভীৰ্ব এর কাছে নাই। লুট-টাই-হাট্ চড়াইয়া লগাই নিজের চালেই রহিয়াছে, একটা কিছু জমাট কথা পাড়ে, নিজের দাত্তিকতার উত্তাপে তখনই সেটা গলাইয়া পাতলা করিয়া দিবে। কিসের চাল উহার এত ? কতগুলো ইংরাজির এঁটো বুকনি ছাড়া জানে কি ও ? আর টাইয়ে নির্গুণ গেরো দেওয়া ছাড়া বোঝেই বা কি ?

অমর বলিল, “মাফ করবেন প্রথমবার, তফাৎ একটু হয় বৈকি কখন কখন,—কখন, you are as much a Bengalee as any of us, কিন্তু আপনি যে ভাষা ব্যবহার করেন সেটা ঠিক আমাদের পরীষ বাংলাদেশের বাজার থেকে কেনা, না, লন্ডনের ওয়েস্ট্ এণ্ডের কোন অকল থেকে আমদানি করা ?”

প্রথম চটে না। গলা তুলিয়া টাই-পিনটা ঝাঁটিতে ঝাঁটিতে শব্দ করে বলিল, “No, it’s direct from London, place from where you

Bengalee writers get most of their ideas—(না, সোজা লিওন থেকে—তোমাদের বাঙালী লেখকেরা যেখান থেকে তাদের বেশির ভাগ লেখার খোরাক সংগ্রহ করে থাকে।) তা তাঁরা যতই গায়ে সরবের তেল মাখুন না কেন—কোমরে, কানে পৈতে জড়িয়ে। ”

মোহিত প্রশ্ন করিল, “ক’টা বাংলা বই পড়ে আপনি এ অভিমতটা দিচ্ছেন, প্রমথবাবু ?”

প্রমথ আলনার খুঁটি থেকে টুপিটা নামাইয়া লইল, তাহার পর ঘুরিয়া সিধা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “None, and I congratulate myself !— (একটিও পড়িনি, আর সেইটুকুই আমার গোরব !) ”

তাহার পর সাহেবী কারদার টুপিটা একটু চালনা করিয়া, “So long !” বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

পশুপতি বলিল, “চান্স কোথাকার !”

কিন্তু রসভঙ্গ হইল। আবার যে কোন্ দিক দিয়া কি ভাবে লেখক শৈলেনবাবুর অলৌকিক আড়ম্বরহীনতার কথাটা উত্থাপন করিবে কেহই ভাবিয়া পাইতেছিল না। মোহিতও চূপ করিয়া রহিল, কিন্তু সেটা যে গান্ধীজীর মৌনতা নয়, সেটা সকলেই মনে মনে বুঝিতেছিল। ঘরটা শৈলেনবাবুর দেশী ভাবে বেশ ভরাট হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু এখন যেন প্রমথর ক্রুর ব্যঙ্গে গমগম করিতেছে। সকলেই আক্রোশে কুলিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ গেল। নীতীন বলিল, “আমার মাথায় এক প্রায়শ্চেষ্ট—ওর উপযুক্ত জবাবও হয়।”

হুই তিন জনে প্রশ্ন করিল, “কি প্রায়শ্চেষ্ট ?”

“শৈলেনবাবুকে অভিনন্দিত করি আশুন সবাই...যে সাহিত্যকে ও হেয়জ্ঞান করছে, ওর নাকের ওপরই সেই বাংলাসাহিত্যের জয়-জয়কার করা হবে।”

সকলেই আগ্রহের সহিত প্রশ্নাবটা লুফিয়া লইল। পশুপতি বলিল, “ঠিক, শুধু সাহিত্য নয়—আমাদের দেশী বাঙালী ভাবটা যে কি—উচ্চ চিন্তার সঙ্গে লিঙ্গমিটি (অনাড়ম্বরতার) কি অকৃত সম্বন্ধ, ও চালবাজ একবার দেখুক। আমাদের ব্যারাকপুরে একবার উদীয়মান নাট্যকার পরেশবাবুকে অভিনন্দিত করা হয়েছিল—কি সিন্দূর !—স্বাভি থেকে নামলেন কাহার একটা খুঁটই ভালো করে গোঁজা নেই।—তিনজন একসঙ্গে নাওলেন, চেনবারই

জো নেই, কে সাহিত্যিক, কে সাহিত্যিক নয় !...ও চালাবায় ভেবেছে কি ?...
ইস, তা-ই আমার !..."



'নো লং !...'

হাওরাটা আবার কতকটা বহলাইল।

অবশ্য আবার প্রশ্ন করিল, "আপনি নিজের চোখে দেখলেন নিজের হাতে
ভেল রাখছেন ?...রাখবার কোন বিশেষ তত্ত্ব লক্ষ্য করলেন না ? আর্টিস্টিক
কিছু একটা ?—বেশন, বকন..."

সবু একটা নতুন পড়িতেছিল, আঙুলের উপর বইটা দুড়িয়া বলিল,

অভিনন্দন তো দিতে চাইছেন আপনারা, তিনি কি রাজি হবেন?—ছুটি আছে তাঁর ?”

সকলে উৎসুকভাবে মোহিতের মুখের পানে চাছিল। মোহিত চিন্তিত-ভাবে খানিকটা মৌন রহিল, তাহার পর জুবুগল উঠাইয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, “হওয়া তো উচিত। যে রকম দেখলাম তাতে তো তাঁকে আমাদেরই একজন বলে ভাবতে সাহস হয়। এ্যাপুরোচ্ করতে, কি রাজি হওয়াতে কোন বেগ পেতে হবে না বলেই তো ভরসা করি।”

নীতীন উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, “নাঃ, তোল চাঁদা ; আমি ছ’টাকা।”

পশুপতি একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, শুনিয়া যেন তাহার আর আশা মিটিতেছিল না ; নিজের সীট থেকে উঠিয়া আসিয়া মোহিতের পাশে বসিয়া প্রশ্ন করিল, “ভয়ংকর সিম্পল, বুঝি ?”

মোহিত বলিল, “বোধ হয় পাঁচ-ছ’ দিন দাড়ি পর্যন্ত কামান নি—দেখে যেমন বুঝলাম।”

পশুপতি একবার সকলের দিকে বিপুল বিষয় এবং প্রশংসার দৃষ্টিতে চাছিল, তাহার পর আবার মোহিতের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “গৌফ রাখেন, না ফেলে দিয়েছেন ?

মোহিত বলিল, “রাখেন।”

লেখক গৌফ রাখেন। এ যুগে থাকিয়াও !...পশুপতির আর বাক্যক্ষুণ্ণ হইল না। এ যে সিম্পলিসিটির চরম হইল।

কয়েকজন একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, “পুরো গৌফ ?...কুৎসিত এক কোণ থেকে অল্প কোণ পর্যন্ত ?...সেকালের ধরণের ?”

মোহিত বলিল, “ইয়েস্।”

শ্রামল বলিল, “ভুল দেখেন নি তো আপনি ?”

মোহিত একটু অসহিষ্ণুভাবে বলিল—“আজ্ঞে না, ভুলও দেখিনি, দেখেও ভুল করবার জো নেই। আপনারদের নকশের মতো মিহি বাটারক্লাই গৌফ নয়তো,—বোন্ড, রীতিমত ওজন আছে। দেখবেনই আজ বাদে কাল।”

তাহাই ঠিক হইল। চক্ষুর্দেয় বিবাদও মিটুক, শুদিকে প্রমথটাকেও উপযুক্ত খামড় দেওয়া হোক।

শৈলেনবাবু রাজি হইরাছেন। মোহিত আসিয়া রিপোর্ট দিল,—“ঠিক ছ’টার সময় আসবেন বললেন। আর বেশিজন থাকতে পারবেন না।”

বক্তৃতা উৎসুকভাবে শ্রবণ করিল, “কেন?”

মোহিত তাহার পানে একটু আড়চোখে চাহিয়া বলিল, “তার সময়ের দাম আছে।”

প্রথম ছিল, বলিল, “Rubbish, that’s style—pure and simple! (হাই, এটা চালবাজি ছাড়া কিছু নয়)।”

মোহিত প্রথম পানে আড়চোখে চাহিল মাত্র, দারুণ অশ্রদ্ধার তাহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না।

শৈলেনবাবুর অভিনন্দনের আয়োজন চলিতে লাগিল। একেবারে ভারতীয় প্রধায় অভিনন্দন করিতে হইবে। ঘরে চেয়ার-টেবিলের নামগন্ধ থাকিবে না। চৌকিগুলি একত্র করিয়া তাহার উপর সতরঞ্চি আর আজির বিছাইয়া দেওয়া হইবে। তাহার মাঝখানটিতে একটি গদি থাকিবে,—হুই পাশে এবং পিছনে তাকিয়া। অভিনন্দনকারীদের পোষাক হইবে ধুতি, পাঞ্জাবি এবং চাদর। অমর প্রভৃতির ইচ্ছা ছিল তাহাদেরই ঘরে আয়োজন হয়, প্রথম কিন্তু আলনা হইতে তাহার কোট-প্যান্ট-টুপি প্রভৃতি সরাইতে রাজি হইল না; অবিকল্প এটা জানাইয়া দিল যে, সিস্টারের নিকট যে ইংরাজী গানটা শিখিতেছে সন্ধ্যার সময় সেইটা লইয়া একটু গলা ভাঁজিবে।

এই ঘরটা একটু বড় ছিল, বাধ্য হইয়া, গান না পৌছায় এরূপ তফাতে একটি চার-সীটের অপেক্ষাকৃত ছোট ঘরই বাছিয়া লইতে হইল।

সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়। উপযুক্তরূপে ঘর সাজাইয়া এবং নিজেরাও ধুতি চাদরে সাজিয়া সবাই অপেক্ষা করিতেছে। মোহিত নাই, সে শৈলেনবাবুকে সঙ্গে করিয়া আনিতে গিয়াছে। নীতীন উষোদন গীত গাহিবে। সকলে মিলিয়া টান্দা করিয়া একটি গান রচনা করিয়াছে, “যম তমসাবৃত্ত”—এর ছন্দ। প্রথম দুইটা লাইন—“গুল—বসন—পর্য—চন্দন কপালে, মতে’ বাণীবরপুরু হে কে এলে”। নীতীন ফরাসের উপর হারবোনিয়ামটা লইয়া কিছু পলার গানটা শাখিতেছে, এমন সময় একটা ট্যান্ডি আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কালো রঙের হুট, কালো টাই, কালো জুতা ও ফেণ্ট-হাট-পর্য একটি তরলোককে লইয়া মোহিত নামিল। কি একটা গভীর নিরাশার ঘেন তাহার মুখটা একেবারে পাণ্ডটে হইয়া গিয়াছে। দৃষ্টি আনত। তরলোক ট্যান্ডিকে ফেণ্ট-হাটটা ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, জিরিয়া হইয়া আগাইয়া আনিতে

গেছেন, কয়েকজনে মোহিতের সান্নিধ্যে আলিয়া দাঁড়াইল এবং বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিল, “এলেন না?”

পশুপতি জিজ্ঞাসা করিল, “সময় হ’ল না বুঝি?”—এমনভাবে প্রশ্নটা করিল যে বেশ বোঝা গেল—সময়ের অভাবেই যদি শৈলেনবাবু আলিতে না পারিয়া থাকেন তো সে মোটেই দুঃখিত নয়।

মোহিত চক্ষু দুইটা জুঁমি হইতে উঠাইয়া আচ্ছন্নভাবে বলিল, “এসেছেন তো; এই যে...আমুন, চলুন ওপরে।”

মুহুর্তের মধ্যেই মোহিতের মুখের পাণ্ডুরতাটা সংক্রামক ব্যাধির মতো সবার মুখে ছাইয়া গেল। সবাই একবার পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল, তাহার পর দুইদিকে সরিয়া দাঁড়াইয়া মোহিত আর সাহেববেশী শৈলেন-বাবুর জন্ত রাস্তা করিয়া দিল।

.

সে রাত্রে আহারের সময় ব্যাপারটা লইয়া আলোচনা হইল একটু।

অমর বলিল, “নাঃ, বড়ই নিরাশ করলে ভ্রমলোক, একেবারে সাহেবী পোষাক!...কি মোহিতবাবু?”

প্রমথ বলিল, “কিন্তু কি কন্ট্রারি, ভোমরাই তাঁকে বড় নিরাশ করেছে—বেডিকেল কলেজের মতো আরগার একটা ভালো social function-এ বোগদান করতে আসছেন বলে ভ্রমলোক ভ্রমোচিত পোষাক-চৌষাক পরে এলেন,—ভোমরা তাঁকে টেনে তুললে যেন কংকুনির আশ্রমে—কলসি, কলাগাছ, দোরে আনপাতার মালা টাঙানো, তার ওপর আশ্চর্যজনক শাদার মুড়ি দিয়ে এক একটা শাদা বকের মতো ভোমরা সবাই ঘুরে বেড়াচ্ছ...it must have been a rude shock for the poor man...(বেচারার খুবই চোট খেতে হয়েছে।)...টুপীর নিচে চন্দনের কৌটা দিয়ে দাগ নি তো? That would have been the climax!” (সেটা একেবারে চরম হ’ত!)

কথাটা কেহ পারে মাখিল না, অর্থাৎ বাহ্যতঃ নীরব রহিল, যদিও অন্তরে সুরুলেই দম্ব হইতেছিল।

কিছুকণ পরে নীতীন বলিল, “আমি একটা কারণ ঠাট্টায়েছি—আর তা যদি সত্যি না হয় তো কি বলেছি।—মোহিতবাবু মেহাৎ বরলা ছোট কাপড় পরে ভেল মাথতে বেখে কলেছিলেন বলেই বোধ হয় উনি একেবারে ইতনিং হুই পরে এসে হাখির হলেন!”

সকলে সশ্রম দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিল। নীতীন গানটা নষ্ট হওয়ার ছুটিয়াও ছিল সব চেয়ে বেশি, বলিল, “তাবলেন—নেহাৎ তেল-জোবড়ানো হেঁজিপেজি লেখক এরা না মনে করে আবার...লেখক, আবি লোকটা কে !...”

অমর বলিল, “সে ছিল আটপৌরে লেখক, এ হ’ল পোষাকী”

পশুপতি বলিল, “তাই বটে।”

কেহ এই ব্যঙ্গ-বিজ্রপের প্রতিবাদ করিল না; হ’ল একজন কুটিল হাত করিল, বাকি সবাই চুপ করিয়া রহিল।

অর্থাৎ নীতীন, অমর, পশুপতির অভিমতটা তাহারা সমর্থন করিল। এবং দারুণ নিরাশার মধ্যে এইটুকুতে বা সাহসনা পাওয়া গেল তাহাই সফল করিয়া সকলে একে একে শয্যা গ্রহণ করিল।

[সাহানা—]

ভক্ত

জারগাটা কলিকাতা হইতে বেশি দূরে নয়, বাহাদুর মোটর আছে এবং সন্ধ্যার দিকে একটু বাহিরের হাওয়া খাইয়া আসিবার পথ আছে, গিয়া ঘন্টা-খানেকের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে পারেন। অনেক বার; অবশ্য জারগাটার যে কোন বিশেষ আকর্ষণ আছে এমন নয়, তবে পথটার একটা বোহ আছে নিশ্চয়,—অজ্ঞাতঃ যুদ্ধ হইতে জানে এমন দৃষ্টির কাছে। প্রথম পিচ-ঢালা পথ, কলিকাতার রক্ততা এড়াইয়া ক্রমশই গাঢ়তর সবুজের মধ্য দিয়া দক্ষিণে নীল চক্রবালের দিকে চলিয়া গিয়াছে—হারাম্ভর পল্লী, প্রথম বাঠ, চারদুনি; আবার পল্লী, বাঠ, বাগান—ক্রমে এই জারগাটা আসিয়া পড়ে, খুব সবুজ, একটা বড় প্রাক। অনেকগুলি ক্ষুদ্রতর প্রাচীর সমাবেশ বলিলেও চলে; বাড়ি, বাগান, দেউল, পাঠশালা, ইন্সুল, জনসমাকীর্ণ বাজার। চারিদিকটা ম্যালেরিয়াবিহীন, হস্তী; তাহারই মধ্যে পুরাতন বাংলার লম্বা হিলাবে কেন বিখ্যাত এই স্থানটুকু বাচাইয়া রাখিয়াছেন। একটু ঢিলাঢালাভাবে বলিলে গেলে এটা যেন তাহার পুরাতন-বিক্রপের একটা নিদর্শন; ঢিলাঢালাভাবে

এই ভক্ত বলিতেছি যে, এটা নবীনের মাঝে ধ্বংসস্থাপন নয়, ধ্বংসের মাঝে কালজয়ী নবীনের প্রতীক।

গ্রামটির নাম রাজগ্রাম।

এই রাজগ্রামে একদিন অপরাহ্নে একটি বেশ মাঝারি সাইজের সীডান-বডি মোটর-কার আসিয়া বড় রাস্তার ধারে একটি গাছের নিচে দাঁড়াইল। ধারেই একটি ছোট বাংলা-গোছের বাড়ি, সঙ্গে লোহার রেলিং দিয়া ঘেরা একটি পরিচ্ছন্ন বাগান। মোটরের কি একটা অংশ সাময়িকভাবে বিকল হইয়াছে, একটু ঠিক করিয়া লওয়া দরকার। মোটরে দুইজন আরোহী; খুব ব্যাকরণভরস্তু করিয়া বলিতে গেলে—একজন আরোহী, একজন আরোহিণী। আরোহী আস্তিন গুটাইয়া মোটরের তদারকে লাগিয়া গিয়াছেন, আরোহিণী মাঝপথে বাহনের একপ ব্যবহার দেখিয়া কতকটা নিরুৎসাহভাবে সামনের আসনে বসিয়া আছেন।

রাস্তার অপর দিকে খানিকটা প্রশস্ত খালি জায়গার পর একটি বেশ বড়-গোছের পুকুর। বেশ একটি ভালো করিয়া বাঁধানো ঘাট, ঘাটের মাথায় দুই দিকে দুইটি শানের বেঞ্চ। একটি বেঞ্চে তিনজন ছেলে বসিয়া আছে—অতুল, বীরেন আর পরিমল। ইহারা স্থানীয় স্কুলের উচ্চশ্রেণীর ছাত্র। আজ স্কুলে সন্ধ্যার সময় একটা মীটিং আছে, সন্ধ্যাপূজার কমিটি গঠন হইবে। ভোট ইত্যাদি লইয়া যে কুটচাল চলিতেছে তাহা লইয়া, সেই সঙ্গে পাশের দুই-তিনটি গ্রামের স্কুলে যে পূজা হইবে সেগুলার সহিত টেকা দেওয়া লইয়া আলোচনা চলিতেছে। এই পথে দলের আরও কয়েকজন ছুটিবে, তাহার পর সকলে স্কুলাভিমুখী হইবে। অতুল ছেলেটি ইহাদের মধ্যে একটু মাতব্বর-গোছের। বছর সতেরো-আঠারো বয়স হইবে, বইরে মুখ শুঁজিয়াই পড়িয়া থাকে না, আরও পাঁচটা ভালোমনা জিনিসের ধোঁয়াখবর রাখে।

মোটরটা আসিয়া এই দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইল। আরোহী বেরামতে নামিলেন, আরোহিণী করতলে কপোল বিজ্ঞপ্ত করিয়া রাস্তার দিক হইতে মুখ করিয়াইরা বসিয়া রহিলেন,—একেবারে বিমুখ হইয়া নয়, আবখানা অর্থাৎ কপাল, নালিকা, ওষ্ঠাধর ও চিবুকের যেরাটা দেখা যায়।

অতুল যেখানে বসিয়া থাকে সেইখানটুকুতেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখে না; একটু পরে হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া বলিল, “তোরা বোস, এলাব বলে।”

উঠিয়া কোঁচাটা একটু ঝাড়িয়া আঘাটা ঠিক করিয়া নিতান্ত নিরুদ্দেশ্যভাবে

মোটরের পাশ দিয়া হনহন করিয়া চলিয়া গেল। অনেকটা দূর গিয়া একটা মোড় পৌঁছ, সেটার ওদিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। খানিকটা পরে তেমনই নির্লিপ্ত গতিতে মোটরের পাশ দিয়া শানের বেঞ্চেতে আসিয়া বসিল। ঠিক সে অতুল নয়, নিশ্বাস ঘন ঘন, সমস্ত মুখটি খানিক রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, আর নীরব। একটা কিছু ব্যাপার হইয়াছেই।

ধীরেন প্রশ্ন করিল, “হঠাৎ অমন করে গেলি আর চলে এলি?”

অতুল একবার ‘উ’ বলিয়া ঘাড়টা বাঁকাইয়া দাঁতে নখ খুঁটিতে লাগিল, ভয়ানক অজ্ঞমনক হইয়া পড়িয়াছে।

মোটর হইতেই এই ভাবান্তরের উদ্ভব, যতদূর মনে হয় মোটরের আরোহিণী লইয়া,—সঙ্গী দুইজনে গভীর অভিনিবেশের সহিত এবং যতটা সম্ভব ভঙ্গতা রক্ষা করিয়া আড়চোখে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। শেষ পর্যন্ত কিন্তু কিছুই বুঝিতে না পারিয়া পরিমল একটু অসহিষ্ণুতাবেই বলিল, “ব্যাপারখানা কি রে? তোর যে বাক্যরোধ হয়ে গেল।”

অতুল কথা কহিল, বলিল, “আগে তাড়াতাড়ি দেখে আর, মোটর সেরে নিয়ে চলে গেলে চিরকাল আপসে মরবি।”

পরিমল বলিল, “হুজনেই যাবো?”

অতুল মন্তব্য করিল, “বাঃ, পার্লিক রোড, হুজন ছেড়ে আমরা যদি চারজন জোট বেঁধে যাই, কার কি বলবার আছে?”

পরিমল আর ধীরেন মন্তব্য প্রয়োজনের তাগিদে কিপ্রপদে মোটরের পাশ দিয়া অতুলের মতো চলিয়া গিয়া রাস্তার মোড়ের ওদিক হইতে ফিরিয়া আসিল। যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া যাওয়া, এদের বাইবার সময় তিনি মুখটা আরও একটু বাঁকাইয়া লইয়াছিলেন, ফিরিবার সময় ইহারাই সাহস করিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিতে পারিল না।

বসিতে বসিতে ধীরেন বলিল, “হ’ল না, ঘাড়টা একেবারে বঁকিয়ে বসলো; কে বল্ দিকিন?”

অতুল বলিল, “তোরা একেবারে অপদার্ব; আমি তো ঠর ঘাড় বাঁকাবার কায়দা থেকেই ধরে ফেললাম, ওইটে ঠর কেবারিটু শোন্।”

পরিমল বলিল, “ইয়ালি রেখে কে বল্ মাইরি, আর একবার না হয় চেষ্টা করি তা হ’লে।”

অতুল কণ্ঠে যতটা সম্ভব সংযত গাভীর আনিয়া বলিল, “বনলতা দেবী।”

পরিমল বিষয়ে একেবারে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল, বলিল, “কিন্দার! —কিন্দার! তিনি রাজগাঁয়ের মতো জায়গার কি করতে আসবেন? রাজগাঁয়ের এত সৌভাগ্য...”

ধীরেনের বিষয় এত বেশি যে, বাক্যশূভিহী হইল না।

অতুল মোটরের দিকে একটা চক্ষু রাখিয়া একটু চাপা গলায় ধমক দিয়া বলিল, “বোস, দেখছেন এদিকে। তোরা যেন আদেখলে হয়ে পড়েছিস্।”

মোটরে আর ঘাটে বেশ খানিকটা তফাৎ হইলেও মাঝখানে কিছু অস্তরাল নাই। পরিমল মুখটা ঘুরাইয়া দেখিল, আরোহিণী তখনও ঠিক এদিকে চাহিয়া না থাকিলেও, এমনভাবে আছেন বাহাতে তীর্থক দৃষ্টিতে কল পাওয়া যায়। একটু অপ্রতিভভাবে বসিতে বসিতে বলিল, “তুই সিওর জানিস—বনলতা?”

ধীরেনের এতক্ষণে যেন সংবিৎ হইল, বলিল, “একটা অভিনয়নের ব্যবস্থা করলে হয় না?”

কথার উপর কথা পড়ায় পরিমল বিচাইয়া বলিল, “দেখছিস্ একটা বিপদে পড়েছেন উনি,—অভিনয়ন।”

অতুল চিন্তা করিতেছিল, বলিল, “সাহস আছে?”

হুইকেনে মুখের পানে জিজ্ঞাস্যনেত্র চাহিয়া রহিল, অতুল বলিল, “তা হ’লে বেয়েলী লজ্জা ছেড়ে একটু এগিয়ে যেতে হয়, ওঁদের সাহায্য দরকার।”

পরিমল উঠিতে উঠিতে বলিল, “রাজগাঁয়ের হুঁভাগ্য—এত বেশি থাকতে এখানে এসেই ওঁদের মোটর বিগড়ে গেল।—তুই সিওর উনি বনলতা দেবী?”

বেয়েলী লজ্জাটা সম্পূর্ণ পরিহার করা গেল না; একটু কৃত্তিত চরণে ইহার আশিয়া রাজার ধারে ঝাঁড়াইল। তিনজনেরই মুখ রাজা হইয়া গিয়াছে। অজলোক মোটরের ওপাশে সুঁকিয়া একটা মন্ব হাতে লইয়া কি তদারক করিতেছেন, আরোহিণী ইহাদের একবার চকিতে দেখিয়া লইয়াই মুখ কিরাইয়াছিলেন, বোধ হয় কোন বকন অস্বস্তি বোধ হওয়ার ধীরে ধীরে কিরিয়া গিলেন এবং অতুল ও অতুলের দেখাদেখি অপর দুইজনেও অভিযান করিতে হাত তুলায় অভিযান করিলেন। একটু চূপচাপ গেল, তাহারই মধ্যে

বাক্সে ফিসফিস করিয়া বলিল, “ঠিক সেই বক্স স্টাইলের নব্বাং! কি মোটা রে অভুল? মনে আসছে না।”

আরোহিণী প্রশ্ন করিলেন, “আপনাদের এখানেই বাড়ি?”

তিনটি কণ্ঠেই একসঙ্গে ত্রুড় উত্তর হইল, “জাঙ্গে হ্যা।” অভুল সেই সঙ্গে প্রতি-প্রশ্নও করিল, “আপনাদের কোন সাহায্যের দরকার আছে?”

আরোহিণী একটু হাসিয়া বলিলেন, “ওকে ভিজেল করুন, আমি তো দিব্যি রাণীর হালে বসে আছি।”

নিজেই আরম্ভ করিলেন, “গুনছো? এঁরা বলছেন...”

ভদ্রলোক উঠিয়া দাঁড়াইলেন, প্যান্ট আর শার্ট পরা, হাতের আঙিন গোটানো, দুই-এক আরগার তেল-কালি লাগিয়া গিয়াছে। মাঝবয়সী লোকটি, একটু বিপর্যস্ত হইলেও মোটামুটি মুখটা বেশ প্রশম। হাসিয়া বলিলেন, “গুনছি।” তাহার পর ইহাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “সাহায্য তো রাণীরই দরকার, কি বলো? তোমরা জ্বলে পড়ো?”

ত্রিকণ্ঠে উত্তর হইল, “জাঙ্গে হ্যা।”

“তা হ’লে তো কুইন-বী অর্থাৎ মকীয়ানীর ইতিহাস...”

আরোহিণী ক্রোধের অভিনয় করিয়া বলিলেন, “কি হচ্ছে ছেলেমানুষদের সঙ্গে?”

ভদ্রলোক বলিলেন, “না না, আমার সাহায্য করলেও সাহায্যটা আসলে বর্তাবে কোথায় তাই বলছিলাম।...আছে দরকার সাহায্যের, কাছে-পিঠে কোথাও মোটরের কারখানা আছে?”

অভুল আগ্রহ সহকারে প্রশ্ন করিল, “ঠেলে নিয়ে যেতে হবে?”

ভদ্রলোক সেই জাতীয় রসিক বাহুব, বাহার্য বিজ্ঞপের সুবিধা হইলে ছেলে, বৃদ্ধা, সমবয়সী কাহাকেও বাধ দেয় না, হাসিয়া বলিলেন, “না, মিজিকে ডেকে আনলেই হবে। যদিও ঠেলে নিয়ে যেতে না পারায় তোমরা বোম্ব হর একটু নিরাশ হবে।”

এরা তিনজনে একটু লজ্জিত হইল, আরোহিণীর কণ্ঠে একটু আপত্তিসূচক শব্দ উঠিল, “আঃ!”

পরিস্রব অভূলের দিকে চাহিয়া বলিল, “কারখানা তো সেই বার নাম তিন বাইল এখান থেকে, তার চেয়ে বলিদবার কাছে যাবো? যদি ঐরা

শকারটাকে ছেড়ে দেন, ওর যন্ত্রপাতি সবই আছে।...কতকণ লাগবে, সূর্যের মনে হয় আপনার ?”

ভ্রলোক বলিলেন, “তা বে রকম বিগড়েছে যন্ত্রা তিনেক লাগবে, শকার যদি একস্পার্ট হয় তো...”

আরোহিণী ভীতভাবে বলিয়া উঠিলেন, “তিন যন্ত্রা! তিন যন্ত্রা এই রাত্তার মাঝে বসে থাকতে হবে ?”

ভ্রলোক বলিলেন, “আর একটা উপায় আছে।”

“কি ? তাই করো।”

“গেটা হচ্ছে তাতা মোটরটাকে বাসিগঞ্জে ঠেলে নিয়ে যাওয়া। ওরা তো তোয়ের রয়েছেন।”

সঙ্গিনী আবার রাগিয়া উঠিলেন, “এই বিপদের মধ্যেও তোমার ভাষা করতে যার ইচ্ছে ?”

উত্তর হইল, “মোটর বিগড়েছে; সঙ্গে সঙ্গে সারাবার উপায় হয়েছে, এটাকে যদি বিপদ বলো, তো সারাবার উপায় না-হওয়াটাকে কি বলতে ?”

সঙ্গিনী অবিকতর ক্রোধে মুখ ফিরাইয়া বসিলেন। এদের তিনজনের মধ্যে ফিসফিস করিয়া কি পরামর্শ হইল; অতুল গলাটা পরিকার করিয়া লইল; সে এমনিই একটু বেশ চনমনে, একটু সংকোচ যা ছিল, সহজ কথাবার্তার গেটা কাটিয়া গিয়াছে, বলিল, “আজ্ঞে, রাজগাঁয়ে এসে যদি আপনাদের মতো দেশের গৌরবকেও রাত্তার বসে থাকতে হয় তো রাজগাঁ কি আর লজ্জার বাধা ভুলতে পারবে ? সে ব্যবস্থাও আমরা করছি।”

আবার তিনজনে কি পরামর্শ হইল, পরিস্রব আর ধীরেন দুইজনে দুই দিকে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল, অতুল উপস্থিত রহিল।

এরিক ওদিক পাঁচরকম গল্পে খানিকটা অতীত হইয়াছে; দেখা গেল, ছোট বড় দলে চারিদিক হইতে ছেলেদের দল মোটর লক্ষ্য করিয়া চলিয়া আসিতেছে, যতই আগে আসিতেছে গতি ততই দ্রুত হইয়া পড়িতেছে; মিনিট কুড়ি-পচিশেকের মধ্যে বিভিন্ন পথে প্রায় জন ত্রিশেক ছেলে আসিয়া অতুলের শিহনে অড়ো হইয়া গেল, আরও আসিতে লাগিল। সকলে যেন হাঁপানি চাশিয়ার ডেটা করিয়া হাঁপাইতেছে, বেশ বোকা বার, প্রথম দিকটা ইহাঙ্গা দুট দিরাই আসিয়াছে। হাতাই, আশেপাশে কিছু কিছু কৌতুকী ইতর-সামারণও আসিয়া জুটিল।

শ্রদ্ধা আরগাটি চাপা কোঁড়ুলগুণ্ণ এনে, নানারকর মন্তব্যে, একটু কবোক বাদপ্রকৃতিপাদে গুঞ্জনিত হইয়া উঠিল। অতুলের প্রতিপত্তি হুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে; সে প্রদানবে ভক্তলোকটির সঙ্গে গল্প করিয়া বাইতেছে, আরোহিণী মাছে মাঝে কিছু বলিলে সেদিকেও খেয়াল রাখিতেছে, উত্তর বা অভিমত যেটি দরকার চালাইয়া বাইতেছে, অবসরমত সঙ্গীদেরও এক-আঘটা চাপা প্রহের চাপা উত্তর দিতেছে, এক-একবার হুই পা পিছাইয়া গিয়া গুঞ্জনকারী-দের মুহু ধমক দিতেছে, “একটু চুপ কর, তোরা ডোবাগি গ্রামের নাম; কি আইডিয়া নিয়ে যাবেন বল্ দিকিন?”

এখানে-ওখানে অনেকগুলি পকেট হইতে নানা হাঁদের অটোগ্রাফ-বুক আত্মপ্রকাশ করিবার প্রয়াস করিতেছে। “অতুলদা!...ভাই অতুল!...অতুল ভাই, কিছু না হোক, শুধু নামটা, নিজের হাতে...”

অতুল চোখ আর হাতের খুব সূক্ষ্ম ইশারা করিয়া চাপা গলার বলিতেছে, “হচ্ছে ব্যবস্থা, সবুয়; কি যে আদেখলে সব।”

পরিমল আসিয়া উপস্থিত হইল, যেন একটা দেশ জয় করিয়া ফিরিতেছে। সঙ্গে একজন শকার, হাতে গোটা দুই যন্ত্র, তাহার পিছনে যন্ত্রপাতির বাক্স লইয়া একটা কুলি-গোছের লোক।

বলিল, “মলিনদা ভয়ংকর হুংখিত, তিনি নিজে আসতে পারলেন না, তাঁর ১০২ ডিগ্রী জর, আর কোমরে অসহ্য বেদনা।”

নিজের কোমরটা অল্প একটু ঝাঁকাইয়া মুখটা কুণ্ণিত করিল।

“তবু মোটরে আসতেন, একটা মন্তব্য সৌভাগ্য কিনা—গাঁয়ের সৌভাগ্য—কিন্তু মোটর দুদিন থেকে, ভেঙে পড়ে রয়েছে। এত হুংখু করছেন, বোধ হয় আরও দু’ ডিগ্রী জর উঠে গেছে। বললেন, মোটর ঠিক হয়ে গেলে একবার নিশ্চয় গুর ওখান হয়ে যাওয়া চাই। ডাক্তার তালুকদারও ছিলেন, আসবার সময় আমার একপাশে ডেকে বললেন, ‘ওদের নিশ্চয় নিয়ে এসো, হার্টটা দুর্বল বাজে, ডিস্ট্রাপেরেন্টমেন্ট-হ’লে টপ করে কোল্যাপ্স করে যেতে পারে।’...নাও হে, তুমি লেগে যাও।”

শকার যন্ত্রপাতি বাহির করিতে লাগিয়া গেল।

ভক্তলোক বলিলেন, “সে কি, তিনি এতটা ক্ষয়ভা করলেন, আর আমরা দেখা না করে কখনও চলে যেতে পারি? তিনি এখানকার কে? জমিদার?”

অতুল পরিমলের পানে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, “কে নন এইনিকার
তিনি ?—সাইক, অ্যাণ্ড সোল !”



‘বড়ী, বয়েশ, ফেটে, বদল, হরকালী...’

বীরেন আসিল,—মুখ নিচু, পঙ্খীয়, ত্রস্ত ; একটু এদিক-ওদিক হইলেই
বেন একটা গোটা রাজ্য হাজিরা হইয়া বাইবে। সঙ্গে একজন বালী।
কাহাকেও কিছু না বলিয়া, কোন দিকে দৃষ্ণাত না করিয়া গোটা বাড়িটার

দিকে দাঁড়া পেট খুলাইল, খটখট করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া রকে উঠিয়া সামনের দুয়ার খুলাইল, মালীটাকে সঙ্গে করিয়া ভিতরে অগ্রসর হইয়া গেল, খটখট রটপট দুয়ার-জানালা খুলিবার আওয়াজ শুক করাইয়া দিয়া, মিনিট দুয়ের মধ্য আবার বাহিরে রকে আসিয়া ভিড়ের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইল এবং আধ মিনিটটাক চোখ বুলাইয়া নাটকীয় পদ্ধতিতে আঙুল উন্টাইয়া ইঙ্গিত করিল, “বতীন, রমেশ, কেষ্ঠ, মদন, হরকালী!”

দলের মধ্যে হইতে নামকরা পাঁচজন কণমাত্রও বিলম্ব না করিয়া সামনে মাথা বুকাইয়া আধা-দৌড়ের চালে জুতা ঘষিতে ঘষিতে উপরে উঠিয়া গেল। আরও কয়েকজন অগ্রগমন করিতেছিল, অতুল কথাবার্তার মধ্যেই ইংরেজীতে বলিল, “নট নাউ!” তাহারা একটু অপ্রতিভ হইয়া গীতে নথ খুঁটিতে খুঁটিতে, কি কোমরে কোঁচা গুঁজিতে গুঁজিতে ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন করিল।

মিনিট দুয়েকও হইবে না, বীরেন আবার বাহিরের রকে আসিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “রেডি। এবার ওদের নিয়ে আসতে পারো, অতুল।”

দুইজনকে লইয়া অতুল বাংলাটাতে প্রবেশ করিল; ‘নট-নাউ’এর যেনটি তখনও বাতালে কনকন করিতেছিল। কিছু গেটের বাহিরে কিছু পেটের ভিতরে, বাহাদের সাহসটা আর একটু বেশি অথবা কৌতুহল-প্ররুতিটা বেশি অনমনীয় তাহারা রকের উপর পর্যন্ত উঠিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। অতুল একবার বাহিরে আসিয়া হাতজোড় করিয়া বলিল, “তাই, উনি একটু হাত-পা ধুয়ে জিরিয়ে নিন, তারপর তোমাদের কিছু প্রশ্ন থাকে, কি কিছু বাণী নেবার থাকে, কি শুধু অটোগ্রাফ-বুক থাকে—সব ব্যবস্থা হবে। তোমাদের মনের অবস্থা বুঝি, কিন্তু একটু ধৈর্য ধরতেই হবে।”

এই দশ মিনিটের মধ্যে অব্যবহৃত বাড়িটা বীরেনের দল এমন করিয়া ফুলিয়াছে যে, মনে হয়, বাড়ির লোকেরা এইমাত্র বেন বাহিরে একটু বেড়াইয়া আসিতে গিয়াছে। চেয়ার-টেবিল বকবকে ভকতকে, দুয়ার-জানালায় খুলির চিকমাত্র বাই, কুলদানিতে কুল, ওদিকে ক্রা হইতে জল ফুলিয়া বাধকবের টব পর্যন্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। আলনার পাট-করা বসবসে তোমাদের, একটা চৌকির উপর বসবসে, করাশ বিছানো, গোটা কয়েক গির্দা, তাহাদের

নতুন খোল ;—কাহার বাড়ি, কে এসব করিল, কখন কি ভাবেই বা করিল ভাবিলে যেন মাথা গুলাইয়া যায়।

বাহিরে ধৈর্য ধরিতে বলিয়া আসিয়া অতুল বলিল, “এঁদের চা-টার ব্যবস্থা তাই পরিমল ?”

পরিমল, ধীরেন আরও সকলে তটস্থ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, পরিমল বলিল “এসে পড়লো বলে।”

“বাধক্রমে জল ?”

ধীরেন বলিল, “রেডি।”

অতুল বলিল, “আপনারা তা হ’লে মুখ-হাত ধুয়ে নিন। মলিনদাঃ ওখান থেকে চা এসে পড়বে এক্ষুনি।”

ছুইজনে একে একে বাধক্রম হইতে ফিরিতে না ফিরিতে দুইটি লোকে প্রচুর জলযোগের সরঞ্জামের সঙ্গে খুব বড় একটা ক্লাবের চা হাজির করিল। ভদ্রলোক কতকটা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, বলিলেন, “একি ব্যাপার ? যন্ত্রপাতি নিয়ে এলে যে আলাদিনের প্রদীপের খানিকটা ফিস্ফাস তোরের করে নিয়ে যেতে পারা যেতো।...না গা ?”

সঙ্গিনী হাসিয়া বলিলেন, “তাই না তাই ; আর তিনি অশ্রুহ, তাঁকে এভাবে ব্যস্ত করা, কি কুণ্ঠিত যে হ’তে হচ্ছে আমায়—কি দরকার ছিল এ সবের ?”

অতুল বলিল, “দরকার হয়তো আপনার নেই, কিন্তু দরকার তাঁর আছে, দরকার রাজর্গায়ের, দরকার, দরকার...”

তাঁদের আতিশয্যে কণ্ঠনালী এমন আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে যে, আর বলিতে পারিল না। পরিমল যোগাইয়া দিল, “দরকার আমাদের।”

ভদ্রলোক যেন একটা ছুতা পাইয়া হাসিয়া বাঁচিলেন, বলিলেন, “এই এককণ্ঠে একটা কাজের কথা হয়েছে,—ঠিক, এসো, তা হ’লে সবাই বসে যাওয়া বাক্।”

পরিমল অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, বলিতে লাগিল, “তাই বললাম নাকি ? সে হয় না, আমি তা মীন্ করি নি ; আমাদের দরকার নান্...”

অতুল, ধীরেন এবং ভিতরের অভ্যন্তর সকলেও আপত্তি করিল, কিন্তু বনলতা দেবীর সঙ্গে আহায়ে গৌরব অর্জন করার বাসনাটা এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে, আপত্তিটা আপনা হইতেই ক্রমে ক্রমে কেমন যেন মিলাইয়

গেল উঁহারাও ছাড়িলেন না। পাত্রের অভাব হইল না, মালী একটা আলমারি খুলিয়া চিনামাটির ডিশ, প্লেট, কাপ ইত্যাদি বাহির করিয়া দিল। বনলতা পরিবেশন করিলেন; জলযোগ-পর্ব শেষ হইল।

সন্ধ্যা উত্তরাইয়া গিয়া অন্ধকার বেশ গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। পরিমল নামিয়া গিয়া একবার খবর আনিল, মোটর ঠিক হইতে এখনও প্রায় ঘণ্টা দুয়েক দেরি। জলযোগ শেষ হইলে বনলতা একটা সোফায় হেলিয়া বসিলেন, সঙ্গীও একটি আরাম-চেয়ারে বসিয়া রূপার কেস হইতে একটি সিগারেট বাহির করিলেন, অগ্নিসংযোগ করিয়া বলিলেন, “ওদের ডাকো; একটু আলাপ-সালাপ করা যাক্ এবার।”

রাত হইয়া যাওয়ার দলটা অনেকটা পাতলা হইয়াছিল, যাহারা বাকি ছিল আসিয়া ফরাশের উপর অথবা চেয়ারে আশ্রয় গ্রহণ করিল; কয়েকজন বিনয়াদিক্যবশতঃ উপরে বসিতেই চাহিল না; যেকোন পাতা শতরঞ্জির উপর ছুই হাত জড়ো করিয়া বসিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তাঁহার নিজেও যে কোন মূল্যই নাই—ভক্তলোকের একথা অগোচর ছিল না, বলিলেন, “নাও, তোমাদের যদি কিছু জিজ্ঞেস করবার থাকে তো শুঁকে জিজ্ঞেস করো।”

একটি ছেলে অত্যন্ত বিনীতভাবে, প্রায় বিগলিত হইয়া প্রশ্ন করিল, “সব কথার কি উত্তর দেবেন উনি আমাদের দয়া করে?”

ভক্তলোক হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, “তা বলে আপনি যদি জিগোস করেন, টিপু সুলতান কোন্ সালে মরেছিল, সে উত্তর কি উনি দিতে পারবেন?”

ছেলেরা অপ্রস্তুত হইয়া গিয়া বলিল, “না, সে কথা বলছি না, সে কথা...”

একটা চাপা হাসি উঠিল; কি বলিতে চাহিতেছিল সেটা আর আপাততঃ বলা হইল না। একে একে বান-দশেক অটোগ্রাফ-বুক বাহির হইল। সাহস বাড়িয়া যাইতেছে, শুধু নাম-সহিতেই কেহ সন্ড হইতে চাহিল না; কিছু ‘বাণী’ও ছাড়িতে হইল। এ পর্বটা শেষ হইলে সকলে আবার আসিয়া বথান্থলে বসিল। একটু চুপচাপ গেল।

অগ্রণী হিসাবে অভুলই আলাপ শুরু করিল। সোজানুজি বনলতার দিকে চাহিয়াই প্রশ্ন করিল, “আমাদের গ্রাম আপনায় লাগছে কি রকম?”

উত্তর হইল, “খুব চমৎকার।”

ধীরেন বসিয়াই অন্ন একটু আগাইয়া বলিল, “কি রকম ‘খুব চমৎকার’?”

অজ্ঞানোকেবর ঠোটে বেন একটু হাসি ফুটিল, সিগারেটে একটা চাপ দিয়া সেটা মিলাইয়া লইলেন। বনলতা বলিলেন, “কেমন এর মধ্যে নিশ্চয় হয়ে গেছে, কলকাতার এতক্ষণ বাস, ট্রাম, মোটর—কান’ বেন বালাপালা করে দেয়।”



‘হয়ত এই পক্ষায় !...’

পরিমল পাশের ছেলেটিকে বলিল, “বলবার ভদ্রিটা মার্ক করে যাঁস, ওর কেবারিট্ স্টাইল।”

অতুল প্রশ্ন করিল, “তা হ’লে রাজগাঁয়ের কথা আপনি ভুলে যাবেন না—আমরা এ রকম আশা করতে পারি ?”

ভক্তলোক চোখ বুজিয়া সিগারেট টানিতেছেন। একপ নিঃশ্বাসে বেন
অভ্যন্তরীণ এই করিয়াই কাটাইয়া দেন।

বনলতা অল্প একটু সোজা হইয়া ডান হাতের উপর বা হাতটা রাখিলেন,
একটু হাসিয়া বলিলেন, “আমায় এতই অকৃতজ্ঞ ভাবেন ?”

সকলে সামনে কুঁকিয়া উৎকট আবেগে চাহিয়া ছিল, পরিমল ‘উন্’ করিয়া
কতকটা সজোরেই শব্দ করিয়া উঠিল, তাহার পর রগ ছুঁটা টিপিয়া চাপা
গলায় বলিল, “ছবছ এই পশ্চার, এই কথা ! কোন্ স্টেটা, কোনবতেই নামটা
মনে পড়ছে না, ...আরে আরে !”

সব প্রশ্নের উত্তর পাইবে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া যে ছেলেটি প্রথমেই কথা
কহিয়াছিল, সে কয়েকবার হাঁ করিয়া আবার সঙ্গে সঙ্গেই মুখ বদ্ধ করিয়া
লইয়া এতক্ষণ কাটাইল। তাহার প্রশ্নটা একটু বেখাপা আর অকৃত বরণের
বলিয়া সাহস সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না ; হাসিমুখে এতবড় একটা
কথা বলিতে শুনিয়া আর নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না ; একটু উঠিয়া
বলিল, “একটা কথা...”

বনলতা বলিলেন, “বলুন।”

ভক্তলোক চোখ খুলিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে তাহার দিকে চাহিলেন।
চোখাচোখি হইতে ছোকরা নিরুৎসাহ হইয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল,
“না থাক্।”

ভক্তলোক আবার সিগারেটে মনঃসংযোগ করিলেন।

ধীরেন প্রশ্ন করিল, “আচ্ছা, কো-এডুকেশন পষ্ছে আপনার মত কি ?
এই—ছেলে-মেয়েদের একসঙ্গে স্কুল-কলেজে যাওয়া সম্বন্ধে ?”

সন্ধিনীর অবস্থা অসুস্থান করিয়া ভক্তলোক নিজেই উত্তর দিলেন, চম্
বুজিয়াই বলিলেন, “মন্দ কি ?”

অল্প প্রশ্ন আসিয়া এটাকে চাপা দিল।

“আচ্ছা, গান্ধীজী সম্বন্ধে আপনার মত কি ?”

বনলতা আবার একটু নড়িয়া বলিলেন, বক্তব্য কপালে ঠেকাইয়া
বলিলেন, “তিনি আমার প্রণয় !”

পরিমলের আবার কোন্ প্রশ্নের কথা মনে পড়িয়া গেল, শব্দ করিয়া
উঠিল, “ইন্ !”

আবার প্রশ্ন হইল, “চরখার সম্বন্ধে ?”

ভদ্রলোকই উত্তর দিলেন। সিগারেটটা সরাইয়া বলিলেন, “তাও প্রশংসাই, তবে দূর থেকে।”

বনলতা তাহার পানে চাহিয়া রাগের অভিনয় করিয়া বলিলেন, “আঃ!”

প্রশ্নকর্তার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আপনি কাটেন চরখা?”

হোকরা একটু খতমত খাইয়া গেল, অতুল বলিল, “ওর বলবার উদ্দেশ্য, বানে আপনি যদি বলেন...”

ভদ্রলোক বলিলেন, “হ্যাঁ, ঠিক, বার-তার কথা শুনে একটা কিনে বস...”

সেই প্রথম-প্রশ্নকারী ছেলেটি হইবার মধ্যে আরও অনেকবার হাঁ করিয়াছে, মুখ বন্ধ করিয়াছে, আর থাকিতে পারিল না। ভদ্রলোকের দিকে একেবারেই না চাহিয়া, বেশ খানিকটা উঠিয়া বলিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, “হ্যাঁ, আমি যা বলছিলাম, আপনার এই কানবালা,—ওই জোড়াটাই কানে দিবে কি আপনি ‘ভঙ্গনের অভিযানে’ অ্যাপিয়ার হয়েছিলেন?”

বাহাকে বলা, তাহার কানের অবস্থা যে কি হইল, অবশ্য বোঝা গেল না। ভদ্রলোকের মুখটাও গম্ভীর হইয়া গেল, ছেলেদের কিস্কিন্দানিও হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। অতুল সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, “স্টারদের ব্যবহারের জিনিস জাতির গোরবের বস্ত্র কিনা? কেউ তাই বলছিল; হলিউডে শুনেছি...”

ভদ্রলোক হাতঘড়িটা দেখিয়া বলিলেন, “মোটরের দেরি কত আর? রাত নটা হ’তে চললো, একবার দেখ তো ভাই।”

অতুল উঠিল, তাহার সঙ্গে বীরেন উঠিল, কেউ উঠিল, পরিমল উঠিল তাহার পর বাকি সকলেই প্রায় একসঙ্গে উঠিয়া পড়িল। গেটের কাছে আসিয়া একটা অটলা হইল। সবাই মুগ্ধ, অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে, কি চমৎকার মানুষ, একটু গুমর বলিয়া জিনিস নাই, আর ঠিক যেমনটি সিনেমার দেখা, সেই চেহারা, সেই পোজ, সেই কথা বলিবার ভঙ্গি,—হাসিটা তো হব্ব সেই। সকলের মুখেই এক অস্বরোধ—“অতুল ভাই, অন্ততঃ রাতটুকুও যাতে থেকে বান তার চেষ্টা করো, চমিশ ঘণ্টা না হোক, একটা রাতও রাজগাঁয়ে কাটিয়ে গেলে বলবার মুখ থাকবে...”

অতুল বলিল, “আমি ঠিক রাস্তা করে আনছিলাম, কথটা পাড়বো পাড়বো, কেউ কানবালার কথা তুলে সব মাটি করে দিলে।...তুই হস্তভাঙ্গা, এত জিনিস থাকতে কানবালার কথা তুলতে গেলি কেন?”

কেই কি বলিতে যাইতেছিল, চারিদিক হইতে থাথা থাইয়া চূপ করিয়া গেল। অতুলের উপর জোর তাগিদ হইতে লাগিল, “রাস্তিরটা কোনমতে কর্তেই হবে রাজি। বলবি, আমরা এতগুলি—এতগুলি...”

পরিমল বলিল, “সোজা কথাটাই বল না, লজ্জাটা কিসের? একটা ভাগ্যি!...এতগুলি ভক্ত মিলে অমরোধ করছি।”

অতুল ভাবিতেছিল, বলিল, “ভক্ত, সে তো আর ঠুকে গিয়ে বলা যায় না; ওটা ছন্দের কথা। যাই হোক, একটা ব্যবস্থা করছি, একটা ঠাউরেছি মতলব। ধীরেন, তুই সাইকেল নিয়ে বৌ করে বেরিয়ে যা, মলিনদাকে বল, ওরা রাস্তিরটা থেকে গেলেন, যত শীগগির হয় ছুজনের খাবার করিয়ে পাঠিয়ে দিতে, বিছানাপত্র তো এখানে আছেই।”

রমেশ প্রশ্ন করিতে যাইতেছিল, “কি মতলব?”

অতুল বাধা দিয়া বলিল, “ঠাউরেছে অতুল বোস একটা। তোমরা কিন্তু বাড়ি যাও সবাই, ভেজাল করলে চলবে না। কাল ভোরে আসবে সব। আমরা তিনজনে রইলাম, আর যতীন আর মদনও থাক না হয়। আর হরকালী, তুই সোজা গিয়ে দোত-কলম নিয়ে বসে যা, একটা অতিনন্দন, পদ্মতে।”

হরকালী বলিল, “বাধাবো কি করে?”

“বাড়িতে ঠাকুর-দেবতার একটা বাধানো পট-ফট নেই? খুলে তার ফ্রেমে এঁটে নিয়ে আসিস, পরে দেখা যাবে।”

রাত প্রায় এগারোটা। আহারাদি সারিয়া বনলতা আর তাঁহার সঙ্গী বাহিরের বারান্দায় বসিয়া আছেন। ছইজনেই দারুণ হুষ্টিভোগে, কাহারও মুখে কোনো কথা নাই, সঙ্গী শুধু উল্লসিত হইয়া নিঃশব্দে চুকট টানিয়া যাইতেছেন।

উহাদের মধ্যে শুধু অতুল আসিয়াছে, বালীটাকে লইয়া হলের ওদিককার ঘর ছইটাতে শয্যা রচনা করিতেছে। বাকি চারজন এখনও আহার সারিয়া আসিতে পারে নাই। সবাই যে আসিতে পারিবে তাহারও কোন স্থিরতা নাই, লুকাইয়া পলাইতে হইবে তো?

বনলতা একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছেন, যে ঘেঘোরে পড়িয়াছেন, দোষ দেওয়াও যায় না। অনেককণ চূপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, “আমি বলছি,

এদের মন্তলব খারাপ, আমার কানবালায় দিকে নজর এইজন্ডেই পড়েছিল।
তুমি বাও পুলিশে খবর দিতে।”

চিন্তিত টানের মধ্যে প্রশ্ন হইল, “যদি হয়ই সেই ধরণের সব, তেঁা আমি
যেতে গেলেই পথ আটকাবে না? চাই কি, খুনজখমও করতে পারে।
আর পথই কি চিনি?”

বনলতা আবার এলাইয়া পড়িলেন, অসহায়ভাবে বলিলেন, “কি
হবে?”

একবার চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন, “হয়েছে, ওরা এখন ওদিকে, তুমি
চট করে বেরিয়ে পড়ো।”

“তোমার একলা ওদের হাতে ফেলে রেখে?”

বনলতা আবার এলাইয়া পড়িলেন, বলিলেন, “তাই তো! আমার
বুক খড়খড় করছে, ওরা রাস্তিরে একটা কাণ্ড করবেই, চারিদিকেই ডাকাতির
খবর শোনা যাচ্ছে আজকাল।”

কাদকাদ হইয়া বলিলেন, “না হয়, এক কাজ করো।”

“কি?”

“ওদের ওই সর্দারকে ডাকো, আমার গায়ের গয়না সব খুলে দিই, প্রাণে
রেহাটু দিক।”

“যদি তেমনই কিছু হয় তো সেই সময় খুলে দিলেই হবে। একটু চূপ
করে দেখ, বিপদে অত উতলা হ’লে চলে না। আমার মনে হয়, ওদের কিছু
নয়, আমার অহুমানটাই ঠিক।”

“তোমার মাথা-খারাপ হয়েছে।”

আবার একটু নিস্তব্ধতা। ওদিককার ঘর হইতে একটু-আধটু শব্দ ভাসিয়া
আসিতেছে, বোধ হয় মশারি পাটাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। একটু পরে
বনলতাই বলিলেন, “একটা টায়ার এদিক-ওদিক কেটে দিলে, একসুটো
চাকাটা সরিয়ে ফেললে—কেউ ঘূণাক্ষরেও টের পেল না?”

“টের পাওয়ার যতক্ষণ সম্ভাবনা ছিল, ততক্ষণ এসব করে নি।”

“আমাদের আটকে রাহাজানি করবারই মন্তলব যদি না থাকে তো কেন
করতে বাবে অবন? তোমার গা-জুরি কথা।”

“ওদের হিংসে নেই, শুধু আমারই আছে?”

“রসিকতা রাখো, ওদের হিংসেটা কিসের জন্ডে শুনি?”

“একদল ভেতরে রইল, সঙ্গে খেলে পর্বত। বারা বাইরে পড়ে রইল, তাদের হিংসে হবে না ?”

“তামার মাথা-খারাপ হয়েছে।”

“মেনে নিলাম।”

“মেনে নিয়ে চূপ করে বসে থাকো।”

“তার একটা সুবিধে আছে; এক-আবটা মোটর গেলে টেটিয়ে থামাবো।”

সঙ্গিনীর বোধ হয় মনে হইল, মাথাটা নিতান্ত খারাপ হয় নাই। একটু চূপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, “মোটর তোমার অন্তে হড়োহড়ি করে আসবে।”

“সম্ভাবনা খুবই কম, রাত বেড়ে গেল, একটা লোকের পর্বত মুখ দেখা যাচ্ছে না, তবু—যদি নিতান্ত...”

অতুল আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিল, “বিছানা হয়ে গেছে, উঠবেন ?”

ভদ্রলোক বলিলেন, “এইখানেই একটু বসি, কঁকায় মল লাগছে না; আপনি বাড়ি চলে যাবেন ?”

অতুল একটু হাসিয়া বলিল, “আমার কি মহামায়া নেই ? এরাও আসছে, সবাই না পাক্ক, পরিমল আর ধীরেন তো আসবেই, আপনাদের কোন রকম ভয় নেই।”

ভয়ের মধ্যে এক রকম কাটিতেছিল, সাধনার কথার বললতা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন, “দেখুন, তর আমরা সত্যিই পেয়েছি...”

সঙ্গী হাতটা টিপিয়া ইশারা করিলেন, কিন্তু বক্তৃতির তখন গলা কাঁপিয়া গিয়াছে, আর নিজেকে সংযত করিতে পারিলেন না, বলিলেন, “না, বাধা দিও না, এঁদের বলি সব...দেখুন, আপনাদের যদি পরনাটরনার দরকার হয় তো খুলে দিচ্ছি, আমাদের প্রাণে...”

আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, ছই হাতে মুখ ঢাকিয়া কঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

কাঁদিবার একটু অবসর দিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, “তুমি শান্ত হও, এদের বিচ্ছেদ অপবাদ দিচ্ছ। মোটর বিগড়েছে অবধি এরা এত করছে, বে...”

অতুল আর সবেম হারাইয়া ফেলিয়াছিল, কতকটা নাটকীয় ভাবেই বসিয়া পড়িয়া বলিল, “উনি তো মিছে অপবাদ দিচ্ছেন না।”

ততলোক বিস্মিতভাবে চাহিলেন।

অতুল বলিল, “মিছে অপবাদ কি করে বলবো? আমাদের মধ্যেই কারও এই কীর্তি। বিশ্বাস করুন, কাল সকালেই তাকে আপনার পারের কাছে এনে হাজির করবো, যা সাজা হয় দেবেন। তবে এও বলি, যেই হোক, আপনি যা বলছেন, ওরকম অভিসন্ধি তার ছিল না...”

নাটকীয় আবেগে তাহারও গলাটা কাঁপিয়া উঠায় আর অগ্রসর হইতে পারিল না।

*

*

*

অতুলের কণ্ঠে আন্তরিকতার গুর ধাক্কা অনেকটা নিশ্চিত হইলেও, রাজিটা উভয়েরই এক রকম অনিচ্ছায় এবং বাহিরে বাহিরেই কাটিল। ক্লান্তি এবং উষ্মে অবসন্ন হইয়া শেষের দিকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, যখন উঠিলেন, একটু বেলা হইয়াছে। অনেকগুলি ছেলে একত্রিত হইয়াছে, আরও আসিতেছে। উত্তরে মুখে-চোখে জল দিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, কালকের সেই শকার আসিয়া কাটা টারারটা প্রায় খুলিয়া বাহির করিয়াছে। কাছেই অতুল, তাহার হাতে এক জোড়া নূতন টারার আর টিউব। তাহার পাশে আর একটি ছেলে, হাতে গোটা দুই মালা আর ফ্রেম-বাঁধনো ছবির মতো একটা কি।

ইহারা বাহিরে আসিতেই অতুল আর অপর ছেলেটি উঠিয়া আসিল, অভ্যস্ত ছেলেরাও পিছনে পিছনে আসিয়া ইহাদের চারিদিক দিয়া ঘিরিয়া ফেলিল—থুব একটা ধমধমে সশব্দ ভাব।

অতুল তাহা একেবারে অস্বস্তি হইয়া রহিয়াছে, টিউব আর টারার জোড়া বা হাতে গলাইয়া লইল, সন্ধ্যার হাত হইতে মালা আর ফ্রেমটা লইয়া বনলতার পানে চাহিয়া হাত দুইটা অল্প একটু চিতাইয়া বলিল, “এই আপনাদের অপরাধী, যা ইচ্ছে হয় সাজা দিন।”

হুইজনে যুব হইতে সত্ত উঠিয়াই এমন অদ্ভুত সমাবেশের মধ্যে পড়িয়া হতভম্ব হইয়া গিয়াছেন। নির্বাক হইয়া মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। অতুল বলিয়া চলিল, “কিন্তু বিশ্বাস করুন, অপরাধীর কু-অভিসন্ধি ছিল না, ওসব দুর্বলতার সে বহু উল্লেখ, তার একমাত্র দুর্বলতা—সে রাজ্যের মতো ভালোবাসে,

আর তার একমাত্র বাসনা ছিল যে—অন্ততঃ একটা রাত কাটিয়েও আপনি সেই রাজপ্রাসাদের ইতিহাসের পাতায় স্বাক্ষর করে...”

ভদ্রলোক বুকিয়াছিলেন, বাবা দিবা বলিলেন, “বাড়ীও, আগে ভাই টারার আর টিউবটা দ্বিগুণ আসতে বলো, ফিট করে কেজুক।”

ভাবের ঘোরে বাবা পাইয়া অতুল একটু সুবড়াইয়া গেল, হাত হইতে টারার আর টিউব বাহির করিয়া পরিমলের হাতে দিয়া বলিল, “বাড়ী তাই, দিয়ে এসো।”

পরিমল প্রশ্ন করিল, “আর কাটা টারার-টিউব ছোড়াটা রাজনারায়ের সম্পত্তি হয়ে থাকবে তো ? স্মৃতিচিহ্ন...”

অতুল করুণ আবেদনের নৈত্রে বনলতার পানে চাহিল। মেয়েছেলের মন বোধ হয় গলিয়া বাইত, কিন্তু ভদ্রলোক তাবরাজ্যে অনেক যা খাইরাছেন, ফাটা টারারটার মূল্য সম্বন্ধেও পূরা জ্ঞান আছে, বলিলেন, “না না, সে কি ঠিক হয়, ফাটা টারারটি দেখে ক্রমাগতই বুক একটা অশ্রু ঠেলে উঠবে, সেটা আমরা প্রাণ ধরে কি করে হ’তে দিই ?”

অতুল একটা বুক-ভাঙা নিশ্বাস মোচন করিল, বলিল, “তবে তাই হোক, বাড়ী তাই। একটা রাত যে একে ধরে রাখতে পেরেছিলাম এই আমাদের পরম সাফল্য।”

তাহার পর ফ্রেমটা সোজা করিয়া, ধরিয়া আবেগ-কম্পিত স্বরে অভিনন্দনটা পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

[শনিবারের চিঠি, কার্তিক ১৩৫০]

কালিকা

যাহারা সৃষ্টিরহস্তের কিছু কিছু খবর রাখে তাহাদের মতে নটু গৌসাইয়ের কস্তা রাধারানীকে গড়িতে বিধাতাপুরুষ একটা মস্ত বড় ভুল করিয়া বসিয়া আছেন—মেয়ে না হইয়া রাধারানীর বেটােছেলে হইয়া জন্মানো উচিত ছিল। অমন আদর্শ বৈষ্ণব পরিবার, বাড়ির কুকুর-বেড়ালটি পর্যন্ত যেন তৃপাদপি স্তনীচ, বাবুখানে ভালগাছের মতো খাড়া, রুক ঐ বিদী ঘেরে ! একেবারে বেমানান। লোকে বলে, “নটু তপস্তা করে ঘেরে-পেরান পেয়েছে—না ভোবে জলে, না পোড়ে আঙনে।”

নতুন কলবরের প্রজ্ঞানটির রূপের পরিচয় এইখানেই একই দিগ্ন রাখা ভালো। কালো, বেশ স্পষ্টভাবেই কালো; ভাববর্ণ কি ঐরকম কোন গোলবেলে বিশেষণ হাতড়াইবার বরকারই হয় না। হাড়কাট মোটা, তাই গড়নটা খুব গোলালো নয়। চওড়া পিঠের উপর একরাশ চুল; অল্প প্রাণশা পাইত, এ মেয়ের কাঁধে, পিঠে সমস্তদিন নাচিরা-কুঁদিয়া, ফুলিরা-কাঁদিয়া একটা বিশৃঙ্খল বোঝা হইয়া থাকে। যাত্রা চোখ দুইটির নিশা করা চলে না,—ভাগর, টানাটানা; তবে বাহারা খুব প্রশংসা করে তাহাদেরও বীকার করিতে হয়—“হ্যাঁ, একটু পুরুষালি ভাব আছে বইকি চাউনিতে—তা বা দত্তি মেয়ে।”

বাপ-মায়ের ভাবনার কুলকিনারা নাই, বয়স তো আর মুখ চাহিয়া কথা কহিবে না? মেয়ে ভাবনার কিনারা দিয়াও যায় না। খুঁড়ি উড়ার, সঁতার কাটে, জল ছাঁচিয়া, ডিঙি ভাসাইয়া হাল টানে; পূজা আগিলে যাত্রার আসর সাজায়, তাড়া আসরে দল লইয়া রাবণের অভিনয় করে। যখন বিয়ের লগনলা নামে, শানাইয়ের বাজে গ্রাম মুখরিত হইয়া ওঠে, তাহার বাপমায়ের মনে আশার শিখাটি নিরাশার ধূমে ক্রমে আচ্ছন্ন হইয়া আসে, রাধারানী সদল-বলে বরযাত্রীদের বিপন্ন করিবার নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবনে মনোপ্রাণে ব্যস্তিরা থাকে।

লক্ষ্যার রঙে রং মিশাইয়া যখন বাড়ি ঢোকে, মায়ের কাছে সেই এক ধরণের বাঁধা অভ্যর্থনা,—“এলেন গেছো মেয়ে! ওলো, তুই আবার ফিরলি কেন, গাছের ভূতপেঙ্গী বেজদত্তি ভাগাড়ে গেছে? নিশ্চয় পারলে না তোকে?”

অত শান্ত নিরীহ মা, কাহারও কাছে মুখ তুলিয়া কথা কহিতে জানে না; লক্ষ্যার মেয়ের শ্রীছাঁদ দেখিয়া কিন্তু তাহারও আর ধৈর্য থাকে না।

মেয়ের কিন্তু এতটুকু খেদ নাই, দুঃখ নাই, গ্রীবাভক্তি করিয়া উত্তর দেয়, “আহা! কি মেয়েই পূর্ণ করেছ! ভূত-পেঙ্গীতে দূর থেকে দেখেই পালার, তার আবার নিতে আসবে...”

—হাসিয়া কলে, সঙ্গে সঙ্গে মার হাতের কাজ কাড়িয়া লইয়া অমিত উৎসাহে লাগিয়া বার—কুটনা কোটা, বাসন মাজা থেকে তাইয়ের হুঁচ বাওয়ানো পৰ্যন্ত যে কাজই হোক না কেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দিনের কীৰ্ত্তি-বিবরণী চলিতে থাকে: “বুঝলে বা, বাঁধের ধারে আজ থেকে বাওরা বুড়িয়ে

দিলে ভগ্নকরা নাহিটো। কুন্ডির সায়েব তাঁর কেলসে, তুই ভগ্নক করতে গেলি কেন বাপু? আমার উল্টে বলে—“তুই তো শিকিয়ে দিয়েছিলি”...বোধ; ইচ্ছা, আমার কি দায়টা পড়েচে শেকাতে বাবার? যেয়েকাত্তর আবি। মাঝখান থেকে স্মরণ চমৎকার কুলগুলো পাঁচকুন্তের পেটে বাবে। আর এই সময় নদীতে বা গঙ্গার কাঁকড়া আসতে লেগেচে বা।...ই্যা, জোয়ার যেমন কথা, আঁচলে রক্ত লাগতে বাবে কেন? বা রে, কতই বেঁধেলে বাবে কেন স্নহ শরীরে?...দেখি, তাই তো গো!—এ মা, মাঝনার কাণ্ড; আমি অত করে পাড়লাম পৈপেটা, আর পোড়ারমুখো কি না গাছের ওপরে গিয়ে কাড়াকাড়ি লাগিয়ে দিলে, অবলা মেয়েমামুষ পেয়ে। তেমনি হয়েওহে, তিনমামুষ ওপর থেকে পড়ে গতর চুর হয়ে গেছে বাছানেনের। রাণীবারনীর মুখের গেরাস খাবে—খাও!...”

গেছো মেয়ের পাকা দেখা হইল গাছের উপরেই। কালিকাপুরের বিষ্ণু ভট্টাচার্য চরণডিহির কালভৈরবীর তলার মানৎ পাঠা বলি দিয়া ফিরিতে-ছিলেন—রাস্তার ধারে, পেরারা গাছের ডালে একটি বারো-তেরো বৎসরের মেয়ের উপর নজর পড়িল। নজর না পড়িয়া উপায় ছিল না।—যেহেটির গাছকোষর বাঁধা, খালি গা, এলোচুল! ডালের উর্ধ্বে উপবিষ্ট একটি ছেলেকে ভূমিসাৎ করিবার শুভ উদ্দেশ্যে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া দোলা দিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হাসি!

বিষ্ণু ভট্টাচার্য কাছাকাছি কয়েক বাড়ি ঘুরিয়া পরিচয় লইলেন, তাহার পর সরাসরি রাধারানীদের গৃহে গিয়া তাহার পিতার নিকট যেহেটিকে গুরুবধূরূপে ভিক্ষা করিলেন। নটু গোঁসাইয়ের কথাটা বুঝিতে এবং বিষ্ণু ভট্টাচার্যের মানসিক স্নহতা সম্বন্ধে সন্দেহ মিটিতে বা একটু দেরি হইল, তাহার পর কথাবাতা স্থির হইয়া গেল। অন্তরের উল্লাস সাধ্যমত সবেত করিয়া নটু গোঁসাই বলিলেন, “তাহ’লে পাকা দেখাটা কবে সুবিধে...”

বিষ্ণু ভট্টাচার্য উত্তর করিলেন, “পেরারাগাছের মগডালে যাকে আমার পাকা দেখেছি, আর দেখেই চিনেছি; আর দ্বিতীয়বার দেখার দরকার নেই।”

বৈশাখের মাঝামাঝি ঘটনা, জ্যৈষ্ঠমাসের গোড়ার বিবাহ হইয়া গেল। শতরের আগ্রহাভিষেবা রাধারানী যিহের পর আর বেশিদিন বাপের বাড়ি থাকিতে পাইল না, আশ্বিন পড়িলে বিজয়ার তৃতদিনে খত্তরবাড়ি চলিয়া

গেল। মা যেহেতু চোখের জলের সঙ্গে নিজের চোখের জল মিশাইয়া বলিল
“লেখানে গিয়ে আর ও সব বেন করতে যেয়ো না মা, রাধারমণ যখন বু
ঝুলে চাইলেন...”

যেহেতু, কৌপানির মধ্যে হস্তটা সজ্জব, স্পষ্ট বলিল, “কিরে আসতে দাও
তারপরে তোমার রাধারমণকে যদি না...”

মা যুথের উপর হাত দিয়া অমললহুচক কথাটা আর শেব করিয়ে
দিল না।

খণ্ডর কালিকাপুরে আসিয়া বধুকে একবার বাড়ির বিস্তীর্ণ সীমানার মধ্যে
ঘুরাইয়া আনিলেন, “বলিলেন এই তোমার পেয়ারা গাছ, মা ; ঐ আম-জাম-
জামকলের বাগান ; মাতার কাটার অস্ত্রও তোমার বাইরে যেতে হবে না ;
দেখছই, মস্ত বড় পুকুর সামনে পড়ে আছে। কাজের দিকে যাবে না, তার
চের বয়েস আছে ; কাজের মধ্যে কাজ রইলো এই মন্দিরটি। নিলে তো
মার সেবার ভার ?...বেশ !...তোমার শান্তুড়ী বাওয়ার পর থেকে মার সেবার
এটি হচ্ছিল বলেই আমার তোমাকে পাইয়ে দিলেন...”

একটু থামিয়া বধুর মাথায় হাত দিয়া হাসিয়া বলিলেন, “নিজের কাজ
ভিজে করবার ইচ্ছে হয়েছে এবার, না গা মা ?”

বধু কথাটা বুঝিল না অতশত, তবুও মাথা নাড়িয়া জানাইল, “হ্যাঁ।”

ঘোর শান্ত লোকটি। প্রকাণ্ড দেবোত্তর সম্পত্তির মারুধানে বাড়ির
লাগোয়া শ্রামা-মন্দির। নিকবে গড়া মূর্তি, পায়ের তলে শ্বেত-পাথরের
মহাকাল ভিমিতনেত্রে শয়ান। মূর্তি বেশি উঁচু নয়, চাহিতেই প্রথমে বরাভরে
তোলা দক্ষিণ হাতটির উপর নজর পড়ে—রক্তাক্ত করতল, তর্জনী আর মধ্যমা
আঙুল দুইটি ঈষৎ লীলারিত, মুখখানি ডাহিনে একটু তোলা, আকাশ-নিবদ্ধ
উন্নত নৃষ্টি—একটি বারো-তেরো বৎসরের কিশোরী নিজেরই ভাবের
সম্মোহনে বেন হঠাৎ নিশ্চল হইয়া গিয়াছে।

কোথাও এতটুকু পাৰাণহ নাহি, শিরী নিজের বাসনান্তর প্রাণ চালিয়া
দিয়া বেন সব কঠোরতা গলাইয়া লইয়াছে। দিখসন অজখানির রোম-রোম
বাকুধের স্রবমার পূর্ণ।

এর সঙ্গে সেদিনের পেয়ারাগাছের যেহেতু কোথার একটি মিল ছিল—
যুব স্বয়ং, তবু ভেবন চোখেই বরা পড়ে। তাই কিছু ভট্টাচার্য তাহাকে লম্বয়ে

আসিয়া বাড়িতে ভুলিলেন। সবচেয়ে ভালো লাগিল তাহার নাবটি—
রাধারাণী! বিষ্ণু ভট্টাচার্যের বনে হইল এই রহস্যময়ী বেয়েটির এ ঘন ঘোর
একটি গুপ্তকথা, নামের অন্তরালে আত্মগোপনের প্রয়াস, একটি হলনা; এই
পাৰ্শ্বাণময়ী মায়ের হাতের ছিন্নমুণ্ডে, কটিতটের করবালিকায় যে রকম হলনার
আভাস লুকানো আছে।

বধু পুরুষ—নাম ধরিয়াছে কোমল! বা মমতাময়ী, হাতে লইয়াছে
ছিন্নমুণ্ড।

যে ধরা দিতে চায় না, সেই মনকে প্রবলতর বেগে টানে।

বিষ্ণু ভট্টাচার্যের রাধারাণীকে পুত্রবধুরূপে ধরে আনার দরকার ছিল বটে,
কিন্তু পুত্রের বিবাহ দেওয়ার মোটেই তাগাদা ছিল না। তাহাকে রাধারাণীর
আসার উপলক্ষরূপে দাঁড় করানো হইল মাত্র।

কালীপদর বয়স বছর চৌদ্দ হইবে, মাথায় রাধারাণীর চেয়ে মুঠাখানেকও
বেশি হয় কি না হয়। বাণেশ সম্পত্তি আছে, খায়দাষ, নিজের খেয়ালখুশি
লইয়া থাকে। সকালে একটু সংস্কৃত পড়িয়া আসে, রাত্রে মৌলবী আসিয়া
খানিকটা ফারসী পড়াইয়া যায়। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন ইংরাজ সবে
এদেশে পা দিয়াছে, শিকার আসরটা সংস্কৃত-ফারসীর মধ্যে ভাগাভাগি করা।

ফল কথা, রাধারাণী যে একটা স্বামী-বিভীষিকা লইয়া বাড়ি হইতে বিদায়
লইয়াছিল, স্বস্তরবাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গে সেটা প্রায় তিরোহিত হইয়া গেল।
সে দেখিল—পুঁটে, গোবরা, মাখনা গোছেরই তাহার একটি সঙ্গী জুটিয়া
গিয়াছে—বরং আরও একটু বেশি অন্তরঙ্গ। জীবনের এই নূতনঘট্টক পুরাতন
ছাঁচে ঢালিয়া লইতে তাহার মোটেই দেরি হইল না।

সংসারটি খুব ছোটখাট, তাহার গতির পথে কাহারও সহিত ঠেলাঠেলি
হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রথম—স্বস্তর, তিনি প্রতিমাটি আর মন্দিরটি লইয়াই
থাকেন। বাড়িতে বিধবা পিসু-শাওড়ী—ঘোর বৈকুণ্ঠ পরিবারের কুলবধু।
অন্নভাবী আর বেজার রাশভারী বাহুবটি—আসিয়া অবধি জগদমায় পাঠা
খাওয়া বন্ধ করিয়াছেন। প্রথম একদিন বলির পর এমন কুকক্ষেত্র কাণ্ড
করিয়া তুলেন যে, বা নাকি সেই রাত্রেই বিষ্ণু ভট্টাচার্যের নিকট আবেদন
হইয়া কাতরভাবে বলেন, “বাবা বিষ্ণু, ঢের হরেচে, এত হেনস্তার চেয়ে বরং
আমায় কুবড়ো-বলিই দিস্ তদিন।”

কথাটা বিষ্ণু ভট্টাচার্য বড় হৃৎধের সহিত হু'একজনের কাছে হাজি করিরাছেন, তন্নীরও কানে উঠিয়াছে, কিন্তু কোন প্রতীকার হয় নাই। তবে এমনি তিনি কোন কথাতেই থাকেন না। ভিতরবাড়িতে জগন্নাথের বিগ্রহ নানামতে তাঁহারই সেবার দিন কাটে।

একটি ঝি আছে, একটি বায়ুনের মেয়ে আশিয়া রাধিয়া দিয়া যায়। এঁা সংসার ;—হুইটি ঠাকুর, আর এই কয়টি মানুষ। একাও বাড়ি—পূজাপার্বণে কাজেকর্মে আত্মীয়-স্বজনদের জোয়ার আসে, ভাঁটার সময় অধিকাংশ ঘরই তালাবদ্ধ থাকে।

রাধারানীর কাজ বাধা। ভোরে উঠিয়া স্নান সারিয়া, এলোচুলের একটি সুরু গোছার একটা গেরো দিয়া, কালীপদকে ডাকিয়া তোলে। হু'জনে ফুল তুলিতে বাহির হইয়া যায়। গাছে উঠিবার পালা থাকে কালীপদর। অশোক আছে, পলাশ আছে, চাঁপা আছে। সুবিধা পাইলে কালীপদ ফুল তুলিয়া রাধারানীর কৌচড়ে ফেলিয়া দেয়। যখন হাতের কাছে পায় না, কিংবা যখন আগড়ালের দিকে অগ্রসর হইতে সাহস পায় না, পা দিয়া ছুলাইয়া ছুলাইয়া রাধারানীকে ধরাইয়া দেয়। রাধারানী হাসিয়া বলে, “ঘেরা ধরালে তুমি পুরুষ নামে, ভয়েই সারা! কি বলবো, আমার হাত নিস্পিস্ করুছে, নৈহাং নাকি ইয়ে হয়েছি, তাই...”

‘ইয়ে’ হওয়ার অস্ত্র যে বড় একটা আটকার এমন নয়। গাছটা একটু ঝাঁকড়া হইলে, এদিক ওদিক দেখিয়া লইয়া বধু কখন উঠিয়াও পড়ে, এ-ডালে ও-ডালে পা দিয়া অসম্ভব অসম্ভব আরগায় গিয়া কৌচড় ভরিতে থাকে; কালীপদ ব্রজভাবে ডাকিতে থাকে, “চলে এসো, ...রাধু, শুনছ? তোমার পারে পড়ি...এইবার তাহ'লে আমি চোঁচাবো...চোঁচাই?...ও বা...!”

শালনের ভঙ্গীতে রাধারানীর চোখের তারকা আয়ত হইয়া উঠে, বলে, “ডাকো বাবাকে, শেষ করেছ কি আমি হাত-পা ছেড়ে নাপিয়ে পড়েছি— বাবা এসে দেখবেন তালগোল পাকিয়ে মরে পড়ে আছি...”

যা মেয়ে, ও তা স্বহস্তে পারে, কালীপদর আর সন্দেহ থাকে না। যেচায়ী ঘোর কাকুতি-মিনতি লাগাইয়া দেয়; লোভ দেখায়; লম্বা কিছু একটা আঁটে আঙুলের দ্বারা এই ধরনের একটা মুদ্রা স্বজন করিয়া বলে, “দেখ, এই এনে দোব, দোবালদের পুরুষপাড় থেকে, পেকে হলদে হয়ে রয়েছে, সত্যি।”

তিনিসটা কামরাঙা। তবে রাঙ্গি হওয়া না-হওয়া নির্ভর করে রাধারানীর মেজাজের উপর। এক এক দিন যেন কোন যন্ত্রের আকর্ষণে নাবিয়া আসে,



‘...রাধু, তুমি ?...’

কামরাঙার নামে মুখে এত লালা জমিয়া ওঠে যে কথা কহা শক্ত হইয়া পড়ে ; সামলাইবার চেষ্টায় মুখে একটা চক্চক্ শব্দ করিতে করিতে বলে, “ঠিক বলছ ? ঠিক ? মা কালীর ঝাড়ার দিবি—বিধো বললে তেরাঙ্গির কাটবে না... আজ্ঞা, তিনলতিয় গালো...”

একেবারে তেরাঙ্গির লইয়া গালাগাল ! মুখটি তার করিয়া কালীন্দ্র বলে, “আমি না তোমার বর হই ?”

এ-ধরনের আলাপনে এক একদিন কথার কথার বগড়াও হয়; আবার কোমলিম রাধারাবী একটু অপ্রতিভ বা অসুতগু হয়—বেশন মেজাজ থাকে; বলে, “হ্যা, তাই আমি বললাম নাকি? চললাম—যদি মিথ্যে বলো—‘বদি’র কথা...”

চলিতে চলিতেই হয়তো হাতটা ধরিয়া ধীরে ধীরে বলে, “সে সব কিছু হবে না, আমি রোজ মা-কালীর কাছে মাথা খুঁড়ি—‘হে ঠাকুর, দেখো, যেন...’”

বৌকের মাথার ঐটুকু বলিয়া আবার লজ্জা হয়, হাতটা ছাড়িয়া দিয়া বলে, “হ্যাঃ, মাথা খুঁড়ি না আরও কিছু, মিছিমিছি বলছিলাম; বয়ে গেছে আমার পরের জন্তে মাথা খুঁড়তে!”

পূজার যোগাড় করিবার সময় আর এক রূপ, রাধারাবী তখন মহা তাত্ত্বিক একজন।—চন্দন ঘষিতে ঘষিতে, কিংবা স্তরে স্তরে বিষপত্র গুছাইতে গুছাইতে প্রশ্ন করে, “তাহ’লে গিরে-কালী কার মেয়ে হ’লেন, বাবা?”

খণ্ডর হাসিয়া উত্তর দেন, “উনি আবার কার মেয়ে হ’তে যাবেন, মা? বিশ্বপ্রসবিনী, উনিই তো সবার মা।”

“তবুও তো কেউ না কেউ বাপ-মা ছিলই। শিবঠাকুরের সঙ্গে বিয়ে দিলে কে?—কালী তো আর ফিরিজী নন, বাবা; তাদের শুনেছি নাকি...”

“পাগলী মেয়ে!” খণ্ডর বাধা দিয়া বলেন, “ওদের কি আবার বিয়ে দেওয়ার জন্তে বাপ মায়ের দরকার হয় মা?—প্রকৃতি আর কব—অনাদি কাল থেকেই ওদের লীলা...”

“আমিও তাই বলি। বাপ-মা থাকলে একটু ব্যবস্থা হ’তই। দেখনা, গায়ে একখানি গয়নার পর্যন্ত বালাই নেই;—আহা!...আর রাধারমণের দেখনা বাবা,—বাবা হ’লেন বহুদেব, নাহয় ধরো নন্দই হ’ল, তিনিও তো হাথের ছিলেন না? কেমন গয়নাগাঁটি, মোহনচূড়ো, রেশমের কাপড়ে অলঙ্কার করছেন ঠাকুর!...আর এদিকে দেখনা,—কপালগুণে বরটিও তেমন ছুটেছেন...আহা!”

হয়তো প্রতিমার দিকে চোখ তুলিয়া চায়। শূভদৃষ্টি উদাসিনী প্রতিমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া কেমন যেন একটা মায়াব মনটি সিক্ত হইয়া আসে। ক্রমে অজ্ঞানতায় হাতটি শিথিল হইয়া আসে,—আহা, বড় যেন রুঢ় কথা বলা হইয়াছে; ঐর বাপ-মা থাক না থাক, উনি তো সবার মা?—ঠিক হয়

নাই কলাটা... হঠাৎ মনে পড়িয়া যায়—বিয়ের করেকদিন আগে কি-একটা
কড়া কথার ভাষার নিজের মায়ের চোখটুকু এই রকমই করুণ হইয়া উঠিয়া
ছিল... হাকদের দায় মুখখানি চোখের সামনে তালিয়া ওঠে—স্বামী বিহীন
পড়িয়া, একা বেয়েমাহুৰ বাড়ি বাড়ি পাট সারিয়া হুপুবে কিরিতেই ছেলে-
বেয়েতে গাভটি যখন ঘিরিয়া ফেলিত... আবার ছোট বেয়েটির নিত্য
রাত্তা কাঁপড়ের করমাস... নিজে এদিকে চিরকুট-পর্য্য, সাত জায়গায়
তালি... কোলে তুলিয়া লইয়া চুমা খাইতে খাইতে বলিত,—“হ্যা, দোব
বইকি, দোব না?”—এই রকম ঠিক মুখের ভাবটি হইত। রাধারানীর
নাড়বিরহিত মনের সামনে এই রকম কত মায় ছবি ফুটিয়া ওঠে—বত
বায়গায় বত মা দেখিয়াছে, সবার—ঐ রকম সব চোখ, বেদনাকুর দুটি
সব ছাড়াইয়া যেন কোথায় গিয়া পড়িয়াছে; কেমন যেন একটা অকৃপ্তভাব
—মা মা মাখানো।

ঠাকুরে মাহুবে মিশিয়া একাকার হইয়া যায়—হঠাৎ মায়ের জন্ত বড় মন
কেমন করিয়া ওঠে, আর তেমনি আকস্মিক ভাবেই শ্রুতিমায় উপর মন
করণায় ভরিয়া ওঠে—“কোথায় তোমার ব্যাখা, মা? তুমি এমন সর্বহারা কেন
হ’তে গেলে?... ”

খস্তুর আড়চোখে দেখেন—বধু হাঁটুর উপর চোখ ঘব্বিয়া অশ্রু মুছিতেছে।
টোকেন না।

স্বামীর কাছে রাধারানী অন্তরের বেদনাটা না জানাই! থাকিতে পারে
না। বলে, “আহা, আমার এত কষ্ট হচ্ছিল দেখে আজ, কে জানে কেন!
ঠাকুরেরা হোন্ ঠাকুর,—কিন্তু এ তো মাহুবের মতন!...”

কালীপদ এক কথায় সব উন্টাইয়া দেয়, “দেখতো বোকামি যেহের?
কালীঠাকুর কিনা ভালোমাহুৰ! এমন ভয়ংকর ঠাকুর নাকি আছে?—পারো
তুমি স্বামীর বুকে পা দিতে?... ডাকাত যে ডাকাত, তাকেও কালীগুজো
করতে হয়...”

রাধারানী একটু অন্তমনস্ক হইয়া যায়। বলে, “তা জানি বশাই, আমার
আর বলতে হবে না।”

ছেলেবেলার একটি দৃষ্ট মনে পড়িয়া যায়। সে সাক্ষিত কালী, গোবরা
সাক্ষিত ডাকাত, নব্বোদের পাকা-কলে-রাত্তা ‘বোহনভোগ’ আমগাছটা হইত
রাজবাড়ি...

কতকটা এই সব স্থিতিতে, কতকটা স্বাধীন কালী-ভগবীর্ষনে মনেক সেই দুর্বল কৰুণ ভাবটি কাটিয়া যায়। আবার পূর্ব উৎসাহে পাছে ওঠা, অলে কাঁপাইঝোড়া, বাগান কাঁপাইয়া হাসি, ছুটাছুটি, দাশাদাশি চলে; স্বাধীন বুকে পা ওঠে না বটে, তবে ক্রমশঃ, ধমকানিতে, টানাহিঁচড়ানিতে সে বেচারীকে যে নিৰ্বাতনটা সজ্জ করিতে হয়, তাহার তুলনার শিবঠাকুরকে ভাগ্যবানই বলা চলে। কালীপদ বড় দুঃখে এক একদিন বলিয়া ফেলে, “তুমি তাই কালীঠাকুরের বাবা! স্বামী বলে আমার একটুও মাজ্জা করো না...”

মাকেরপাড়ায় নবনারীতলায় যাত্রা ছিল; ‘শুভদ্রা-হরণ’ পালা; বিকালবেলা শেষ হইল। শিশীমা যে রকম শুছাইয়া-শুছাইয়া নবনারীর মন্দিরে মালায় বসিলেন, শীঘ্র উঠিবার সজ্জাবনা নাই। কালীপদ সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার জন্ত থাকিয়া গেল। অজুন-শুভদ্রার কেমন একজোটে কাজ। রাধারাণীর মনে অব্যক্ত কি একটা হইতেছিল, বলিল, “তুমি তার চেয়ে চলোনা কেন?—ঝি থাক।”

কালীপদর মনে অজুনের বীরত্বের আঁচ তখনও লাগিয়া আছে, বলিল, “তা কি হয়? একজন বেটাছেলে থাকা ভালো।”

রাধারাণী নিচের ঠোঁটটা একবার উন্টাইল, বিজ্রপে; তাহার পর ঝিরের হাত ধরিয়া বাড়িমুখে হইল।

পথে কথায় কথায় বলিল, “শুভদ্রাঠাকরুণ কেমন কড়া হাতে বাগিয়ে ধরলো, ঝি!”

ঝি বলিল, “সব মেয়েমানুষেই পারে।” তাহার পর রাধারাণীর জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে বলিতেছিল, “আহা, দিদি ঠাকরুণ যেন কিছু জানেন না,—কেন মেয়েমানুষের ঘোড়া হ’ল সোরাবী, রাশ মানে হ’ল...”

এমন সময় তাহাদের ঠিক সামনে একটা মাটির ঢেলা পড়িয়া চুর হইয়া গেল এবং তাহার সঙ্গে বাঁধা একটা কাগজের টুকরা ছিটকাইয়া রাস্তার ধারে পড়িল। ঝি, “ও মাগো!” বলিয়া শুটাইয়া-শুটাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

রাধারাণী একবার চারিদিকে দেখিয়া লইল—কেহ কোথাও নাই। একটু আপসাইয়া গিয়া কাগজটা তুলিয়া লইল। নিজে পড়িতে জানে না; ঝি পড়িয়া দিল—তাহার পরিবারে সব ব্যক্তার পান বাঁধে; লেখা আছে—“নার মহাপুজার রক্ত তর্পণ। শনিবার, তিথি শ্রাবণ-অমাবস্যা। তৈরব।”

হুঁজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিল। ‘সুভদ্রা-হরণ’ দেখিয়া যে অস্বপ্নেরূপা জাগিয়াছিল তাহা আর বেশিকণ রহিল না, বিশেষ করিয়া স্বির; জোরে হাঁটিতে হাঁটিতে সে উল্লস-বাসে দৌড় দিল। বিষ্ণু ভট্টাচার্য মন্দিরে ছিলেন, চিঠিটা তাহার হাতে পৌছিল।

কথাটা রাষ্ট্র হইতে দেয়ি হইল না। তিন আরগার এই কব্ব চিঠি পড়িয়াছে, পাড়ার ঠিক তিনটি কোণে,—ওদিকে অধর চৌধুরীর বাড়ি, প্রাচ্যের অপর প্রান্তে সনাতন চক্রবর্তীর বাড়ি, আর মাঝখানে এই বিষ্ণু ভট্টাচার্যের বাড়ি। তৈরব-ডাকাতের প্রথাটাই এই; লোকে এই জন্ত বলে—“তৈরব সর্দারের মহাজাল পড়েছে।”

কিন্তু এ তো সকলেরই জানা কথা যে মার আদেশ না পাইলে তৈরব বাহির হয় না, তবে এ গ্রামে মার পূজার কি জট হইয়াছে?

বিষ্ণু ভট্টাচার্য সমস্ত রাত মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বর্ণা দিয়া পড়িয়া-ছিলেন, সকালে রুদ্ধ দ্বারের উপর করাঘাত পড়িল। দ্বার উন্মুক্ত করিয়া তিনি চৌকাঠের উপর দাঁড়াইলেন। সামনে দালান ভরিয়া একদল লোক। মুখপাত্র হিসাবে বৃদ্ধ নিবারণ ঘোষাল আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, “বিষ্ণু, ধরা দিয়ে কার কাছে সাড়া পাবে?—মাকে কি রেখেছ? বলি-হীন শক্তি-পূজা—এ অনাচার গ্রামে সহ্যবে না, হয় আজই ন’টি বলিদানের ব্যবস্থা করো, না হয় মাকে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে এসো—একের পাপে সারা গ্রাম বে যায়!”

বিষ্ণু ভট্টাচার্য বলিলেন, “আমার কি অসাধ কাকা? তবে...”

চারিদিকে রব উঠিল, “তবে-তবে নয়, পাঠার সব ঠিকঠাক, আমরা নিয়ে আসছি, আজ রক্তের স্রোতে গ্রামের পাপ ভাসিয়ে তবে কথা...”

দলটা আস্তে আস্তে কিছুকণের জন্ত একটু পাতলা হইল, তাহার পর ক্রমেই আবার জমাট বাধিয়া উঠিতে লাগিল,—লোকের হাঁকডাকে, ‘মা-মা’ শব্দের সঙ্গে একপাল শিশুছাগের ত্রস্ত চিৎকার মিলিয়া আরগাটাকে সরগরম করিয়া তুলিল।...ক্রমে পূজা শুরু হইল, হাড়িকাঠ পোতা হইল, একটি ছাগশিশুকে স্নান করাইয়া মন্দিরে উঠানোও হইল। মন্দির হইতে গলা বাড়াইয়া একজন প্রের করিল, “বাজনদারেরা তোদের আছে?—দিক্ চাকে বা দিক্ এবার...”

কালীপদ, বউ আর চাকে যা পড়িল।

এমন সময় সিংহাসনতল অগস্ত্যকে বুকের কাছে লইয়া, নামাবলী গায়ে একজন গৌরকান্তি বিধবা খুব সহজভাবে ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া বারান্দার উঠিলেন, এবং একটু জলছিটা দিয়া, সিংহাসনটি রাখিয়া গম্ভীরভাবে তাহার সম্মুখে অপেক্ষা করিলেন।

বাল্লভার আগন্তুক সঙ্গে সঙ্গেই খামিয়া গেল। তাহার অন্তঃকণ্ঠের মধ্যেই মাহুকের ভিড়ও গেল, পাঠার কাৎরাণিও গেল; মন্দিরের মধ্যে শুধু বিষ্ণু ভট্টাচার্যের পূজার মন্ত্রগুলি শোনা যাইতে লাগিল—খুব সংযত স্বর।

সন্ধ্যার সময় রাধারাণী যখন আরতির যোগাড় করিতে আসিল, দেখিল মন্দির ভিতর হইতে অর্পণবদ্ধ। দরজার বা দিল, ডাকাডাকি করিল; যখন কিছুতেই দরজা খুলিল না, নিতান্ত মনমরা হইয়া চুপিচুপি বিছানার গিয়া শুইয়া পড়িল। ঐ, রাধুনী আহারের জন্য ডাকিতে আসিয়া কাঁচ দেখিয়া মানে মানে সরিয়া পড়িল। কালীপদ অনেক সাধাসাধি করিল, সে নিজেও খাইবে না বলিয়া ভয় দেখাইল, কোন ফল না হওয়ার ধীরে ধীরে উঠিয়া আহার করিয়া আসিয়া পাশটিতে শুইয়া পড়িল।

যুম আসিতে কালীপদের বোধ হয় রাত হইয়া থাকিবে, সকাল বেলা দিবা কোঁস কোঁস করিয়া নিত্রা দিতেছে,—“ওঠ, ওঠ, শীগ্গির ওঠ গো!”—বলিয়া তীব্র কাঁকানি দিয়া রাধারাণী তাহাকে ঠেলিয়া তুলিল। তাঁর রগড়াইতে রগড়াইতে কাৎ হইয়া কালীপদ প্রশ্ন করিল, “কেন?”

রাধারাণী ভীতকণ্ঠে বলিল, “ডাকাত পড়েছে যে!” তাহার পর কালীপদ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিতেই খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কালীপদ হাসিয়া বলিল, “বাক্সা, কি ঘেয়ে যে!—এখনও বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে।”

রাধারাণী হাসিতে ছলিয়া ছলিয়া বলিল, “যেমন তীক্ষ্ণ...”

কালীপদ রাগতভাবেই বলিল, “ভারি বীরপুরুষ আমার! ডাকাতদের ঠেকিও তারা হাজির হ’লে।”

রাধারাণী ভাঙ্ছিলের সহিত ক্রুদ্ধকিত করিয়া বলিল, “পারি না নাকি?—আহা, বড় শক্ত!...ওরা ঘেয়েদের কিছু বলে না মশাই, তাতে কালো

বেয়ে, ভাত্তে আবার স্বপ্ন দেখেছি, যা কালী এসে নিজের গায়েই যা আবার
খানিকটা মাথিয়ে দিয়ে গেলেন।...বিদ্বান হচ্ছে না বুঝি?" হাতটা
কালীপদর বুকের কাছে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "এই দেখ, বাইনি হয়ে আর
এক পৌছ কালো?"



'...আহা-হা!...মরে বাই!...'

তাহার পর আবার গায়ে একটু ঢলিয়া কৃত্রিম করণার স্বরে বলিল, "আহা
হা—হা, একজনের কনে আরও কালো হয়ে গেল গো!...আহা—হা—হা,
মরে বাই, মরে বাই!..."

কালীপদ বলিল, “হ’ল জে বয়েই গেল।...মা কালী রঙের পোছ দিয়ে কি বললেন? বললেন বুঝি—‘ডাকিনী, যোগিনী হয়ে আমার লবে’...”

রাধারানী মুখ হঠাৎ কোকুচ্ছটার প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; বলিল, “ঠিক কথা গো, অগ্রে আর একটা বড় মজা হয়েছিল; বড় মজা; কিন্তু বা ভীতু ছুনি, বলাই বুঝা, শুনলেই ভিঁবি বাবে। আমার বেন মনে হ’ল, মা কালী এলে বাবাকে ঘেঁষে খেঁষে তুলে বললেন,—‘ওঠ, আমি বাড়ি জুড়ে রয়েছি, তর কি?’ তারপর হাসতে হাসতে আমার কাছে এসে...চলো ফুল তুলতে ফুলতে সব বলছি, চলো না...কালীঠাকুর আবার এত নকলও জানেন!—কি, আমি নিজেই যুগুতে পারিনি, শুয়ে শুয়ে এই সব তত্ত্বার দেখছি, কে জানে?—বাবার সঙ্গে মনটা বা ছটফট করছিল...চলো, ওঠো, সব বলছি...”

অনেকক্ষণ ধরিয়া পুরুষধারের ধুকপানা নারিকেল পাছটার গোড়ায় বলিয়া গল্প চলিল,—শুধু গল্পই নয়, কত সব জল্পনা-কল্পনা, মান-অভিমান, জেদাভেদি, এমন কি ছাড়াছাড়ি পর্যন্ত। শেষ নাগরিক কিন্তু আবার সব ঠিক হইয়া গেল; সাজিতরা ফুল-বিছপত্র লইয়া গল গলি হইয়া হু’জনে বাড়িমুখে হইল। মন্দিরের সিঁড়ির কাছে আসিয়া কালী বলিল, “আমি তাহ’লে একুশি আসছি; ভয় করলে...”

তাচ্ছিল্যের সহিত ‘ইস!’—করিয়া রাধারানী মন্দিরে গিয়া গেল।

অমাবস্তা তিথি। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বিষ্ণু ভট্টাচার্য মন্দির হইতে বাহির হইলেন। কি ভাবিলেন তিনিই জানেন—ধীরে ধীরে বাড়িতে গিয়া সমস্ত ঘর সমস্ত দেওয়াল-সিন্দুকের তালাচাবি খুলিয়া আবার শান্তভাবে নামিয়া আসিয়া চাবির তাড়াটা প্রতিমার পদমূলে রাখিয়া দিলেন।

“বাবা?”—বলিয়া রাধারানী বিমূঢ়ভাবে প্রশ্ন করিতে যাইতেছিল, হাত ছুলিয়া বারণ করিলেন। তাহার পর কি ভাবিয়া তাহার মুখের দিকে গাহিয়া নিজেই বলিলেন, “আজ যে মা আসছেন, মা!” আবার পূজার ধলিলেন।

রাত্রি বধন প্রায় দুই প্রহর অতীত হইরাছে, হঠাৎ চক্রবর্তীদের পাড়ার দ্রুত এক শব্দ উঠিল—“রে-রে-রে-রে-রে।...”

কালীপদ আর রাধারানী পূজার কাছে বলিয়া ছিল; কালীপদ একটু কাঁপা লাগ ডাকিল, “বাবা!”

উত্তর পাওয়া গেল না। কিছু ভট্টাচার্য অনেকক্ষণ হইতেই প্রণয় করিতে ছিলেন, বুঝা গেল সংজ্ঞা নাই। কালীদাস বাবারাষ্ট্র বুকের পানে চাহিল।

রাখারানী বলিল, “তোমার ভয় করছে নাকি ?—বাবার বুকে ভুলে তো ? ভয় করলে আবারে বাড়িতে যা ‘কালী’ আর আসবেন কোথা থেকে ?”—বলিয়া বেশ সঙ্কটভাবেই হাসিয়া উঠিল।

ক্রমে কোলাহল আরও তীব্র হইয়া উঠিল। ও পাড়ার গাছপালার মধ্যে পুঞ্জীভূত অন্ধকার মশালের আলোর খণ্ডিত হইয়া গিয়া বিকশিত-বহুটা দৈত্যের মতো বিকট হইয়া উঠিল।

প্রায় বটা দুয়েক পরে দলটা এ-মুখো হইল। তৈরব সর্দার আগে আগে, পিছনে ধ্বংসোদ্ভূত প্রায় শতাবধি লোকের একটা দল। বাগানে প্রবেশ করিয়া সবাই সমন্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল। তৈরব বলিল, “আজ্ঞে রে, এটা মারের বাড়ি।”

একজন কক্ষস্থরে উত্তর করিল, “উপোসী মারের পুজো দিতে এসেছি, জানিয়ে আসবোনা ?”—এই কথার উপর আর একটা উত্তর নিম্ন উঠিল।

দলটা আসিয়া মন্দিরের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইল। মন্দির অত্যন্তরূপ দীপের স্তিমিত আলোকে দেখা গেল রক্তচেলি-পরা একটি গৌরবাস্তি পুরুষ প্রতিমার সামনে ভুলুষ্ঠিত হইয়া পড়িয়া আছে, অত শব্দের মধ্যেও নিশ্চল। সবাই তেলিয়া মন্দিরে উঠিতেছিল, তৈরব পিছনের চাপে ছুই পা অগ্রসর হইল, তাহার পর অমিতে শক্তভাবে পা পুঁতিয়া, দক্ষিণ হাতটা উঠাইয়া বলিল, “না, উঠতে দে ; অসাড়ের রক্ত মা ধার না ; জাণ্ডক, ততক্ষণ ও দিকটা সেরে আসবি চল্ শব, কিছু যেন চিহ্ন না থাকে...”

দলের নির্দিষ্ট একটা অংশ বাড়িটা ঘিরিয়া ফেলিল। গগন বিদীর্ণ করিয়া ‘রে-রে’ শব্দ, গ্রামের চতুঃসীমা হইতে তাহার প্রতিধ্বনি উঠিতেছে। সে যুগে ডাকাতরা প্রথমে সমস্ত গ্রামটা ঘিরিয়া ফেলিত।

মন্দিরের পিছনে, কাঠাকরেক জমির পরেই বাড়িটা। মশালের ধূমলিন আলোর দূর থেকেই দেখা গেল, কোথাও জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নাই ; পুরীর মুক্তধার গৃহগুলার বাহিরে আলো পড়িয়া ভিতরকার অন্ধকারকে স্পষ্ট আর বীভৎস করিয়া তুলিল।

এ-ধরণের বিরোধহীন অবরোধে তৈরব সর্দার অত্যন্ত ছিল না। ডাকাতি করিতে আসিয়া যদি উত্তর পক্ষেই হুঁচারটা বাধা না পড়ে তো

ভরোয়ালে আর সিঁধকাটিতে ব্যবধান থাকে কোথায় ? পা তুলিয়া তাহার পা দুইটা যেন ভারালস বলিয়া বোধ হইল। নিশ্চল হইয়া একটু দাঁড়াইল, তাহার পির হঠাৎ জোর করিয়া আগাইয়া জোর করিয়াই রাগিয়া বলিল, “আর এগিয়ে, তোরা সব থমকে দাঁড়াস যে !”

অনায়াস লুষ্ঠন। বাড়িটা যেন মুক্তাঞ্জলিতে সমস্ত ধনসম্ভার লইয়া অপেক্ষাই করিতেছিল, শুধু লওয়ার দেরি। ভৈরব সদাঁরের একটা অহেতুক অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। সে কি ভাবিল বলা যায় না, শুধু একটি মাত্র মশাল আর মাত্র জন পাঁচেক লোক সঙ্গে রাখিয়া বাকি সমস্তই বাহির করিয়া দিল। বোধ হয় ভাবিল, অন্ধকার বাড়িতে খুঁজিয়া-পাতিয়া আবার খাইয়া লুষ্ঠন করিলে তবুও বিরোধের একটু আশ্বাদ পাওয়া যাইবে, তবুও ডাকাতির যথাদাটা কতকটা বজায় থাকিবে। মাহুকের নিকট নিরাশ হইয়া সে যেন অন্ধকার বাড়িটাকে সজীব করিয়া তাহাকেই যুদ্ধে আহ্বান করিল।

সবচেয়ে কীংশিখ মশালটা লইল, নিজের হাতেই লইল। তাহার পর সেই অল্পসংখ্যক সঙ্গী লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এ-ঘর ও-ঘরের ভিতর দিয়া, ডালাখোলা বাল্ল উজাড় করিয়া, বারান্দা দিয়া চলিয়া আসিতে একটা একটু প্রশস্ত জায়গা ; তাহার পর সন্ধ্যা এক কালি গলি, ধুমে আর ছুঁটা লোকের বিকট ছায়ায় যেন ভরাট হইয়া গেল। কোনখানে একটু শব্দ নাই, আতলাদ নাই ; নিস্তব্ধতার মধ্যেও যে ভক্তিত প্রাণের একটা পরিচয় সে পাইয়া আসিয়াছে এই প্রাণহীন পুরীতে সেটার অভাব তাহাকে পীড়িত করিতে লাগিল। এই অস্বাভাবিক অবস্থায় সদাঁরের কেবলই মনে হইতে লাগিল, আজ মায়ের শ্রশানকালীর পারে অবাকুল দাঁড়ায় নাই, মা পূজা লন নাই।...মনকে শান্ত করিবার জন্য মনে মনে বলিল, “মা, তোমার পূজো আজ এইখানেই ; তপ্তরক্তে পূজো চাই, তাই অব্যব তুষ্ট হও নি। তুমি আজ শ্রশান হেঁড়ে এসো, তক্ত তোমার অন্তে আজ এইখানেই শ্রশান সৃষ্টি করে দেবে।”

ভৈরব কোবরে অভ্যাসে বক্তব্যের বধ্য হইতে একটা বোতল বাহির করিয়া তাহার মধ্যে ভয়ল পদার্থ চক্চক করিয়া গলার খানিকটা ঢালিয়া দিল,—কায়ল-বারি। পরে চিত্তের দুর্বলতা দূর করিবার জন্যই হোক, বা যে জড়ই হোক, মশাল তুলিয়া একবার “জয় কা !” করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—পাঁচজন বোস দিল, উন্নত মশালের আলোর ছায়ায় যেন হঠাৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

